২১ এপ্রিল ২০১৩

রবি

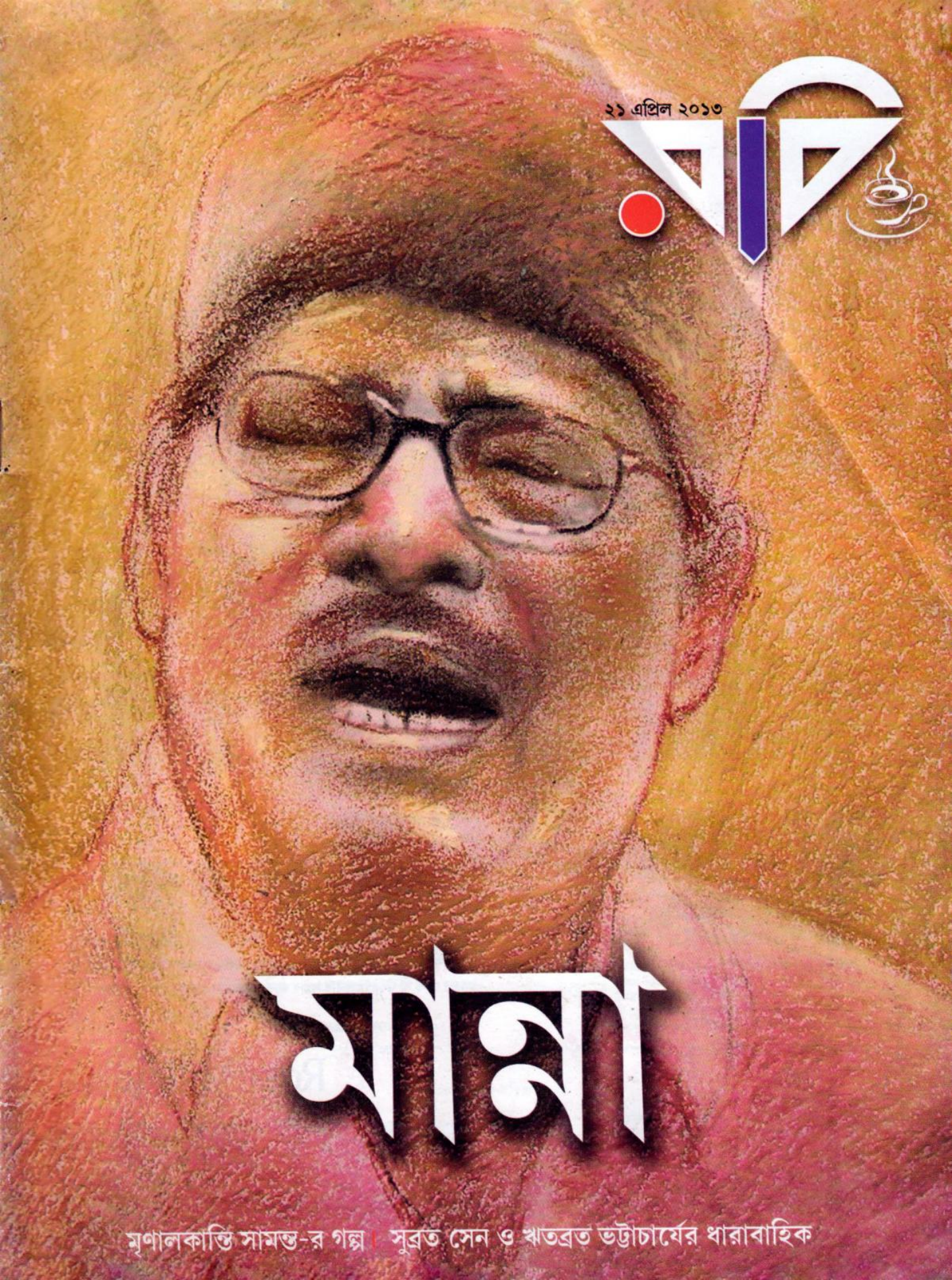

মান্না

মৃণালকান্তি সামন্ত-র গল্প। সুব্রত সেন ও ঋতব্রত ভট্টাচার্যের ধারাবাহিক

Taste me..
গুঁড়ো মশলা

আহারে আহারে
স্বাদের বাহার!

বাছাই করা খাঁটি মশলা দিয়ে তৈরী টেস্ট মী গুঁড়ো মশলা প্রতিটি রান্নায় নিয়ে আসে গোটা মশলারই মতো মনমাতানো স্বাদ আর গন্ধ। আজই আপনার রান্নাঘরে নিয়ে আসুন টেস্ট মী গুঁড়ো মশলার সম্ভার আর বেছে নিন লাজবাব্ স্বাদ, প্রতিবার।

A product of

Rose Valley™
Happiness Unlimited

Corporate Office: Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5, Block - DP, Sector - V, Kolkata - 700 091
Ph.: 033 - 4025 4025, 4025 4444, 4025 4000
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries call or e-mail
033 4019 7037
care@rosevalleyindia.com

খবর ৩৬৫ দিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

রবি

২১ এপ্রিল ২০১৩ | বর্ষ ২ | সংখ্যা ১১

প্রচ্ছদ ৫

মান্না

তিনি মান্না দে। ভারতীয় গানের জগতের অপরিহার্য এক ঈশ্বর। এক জীবন্ত কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী। রবীয়ান মহান এই গায়ককে নিয়েই লিখেছেন—

জয় চট্টোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি মিশ্র,
অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়
সুপর্ণকান্তি ঘোষের সাক্ষাৎকার— নিবেদিতা দে

গল্প ২৪

আঁধারের ছেলেপুলে
মৃণালকান্তি সামন্ত

ধারাবাহিক ১ ৩১

বানভাসি
সুব্রত সেন

কবিতা ৪২
বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাবাহিক ২ ৩৭

বসন্ত উৎসব
ঋতব্রত ভট্টাচার্য

নিয়মিত বিভাগ

উদাসী বাবার আখড়া ৪৪
ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

আরব্য রজনী ৪৮

বুলবুল ভাজা ৫০
হরিদাস পাল

প্রচ্ছদ: সুমন কবিরাজ

সম্পাদক **পূষন গুপ্ত** ▮ সহযোগী সম্পাদক **সুব্রত সেন**

রোজভ্যালি পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে পূষন গুপ্ত কর্তৃক ২ টেম্পল স্ট্রিট, তৃতীয় তল, কলকাতা - ৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।
সম্পাদকীয় দফতর: সার্কুলার কোর্ট, ষষ্ঠ তল, ৮ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৭।

গোটা মশলার স্বাদ
এখন গুঁড়ো মশলায়

রান্নার আসল আস্বাদ পেতে এখন আর গোটা মশলার প্রয়োজন নেই। টেস্ট মী গুঁড়ো মশলা তৈরী বাছাই করা খাঁটি মশলা দিয়ে যা প্রতিটি রান্নায় নিয়ে আসে লাজবাব্ টেস্ট। আপনার কিচেনে নিয়ে আসুন টেস্ট মী আর দেখুন রসনায় কিভাবে আসে জাদুর ছোঁয়া।

Taste me..
গুঁড়ো মশলা

A product of

Rose Valley™
Happiness Unlimited

Corporate Office: Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5, Block - DP
Sector - V, Kolkata - 700 091
Ph.: 033 - 4025 4025, 4025 4444, 4025 4000
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries, call: +91 91633 24060

megaminds.in

অজানা জগতের সুলুকসন্ধান দিল ‘রবি’

সারা দেশেই পাতালজগতের ডনদের কেরামতি সমানতালে হয়েই চলে। মহানগরী কলকাতার মধ্যে বিরাজ করা আন্ডাগ্রাউন্ডের হালহকিকতের যে সন্ধান দিল ‘রবি’ তা আমাদের অনেকের অজানা।

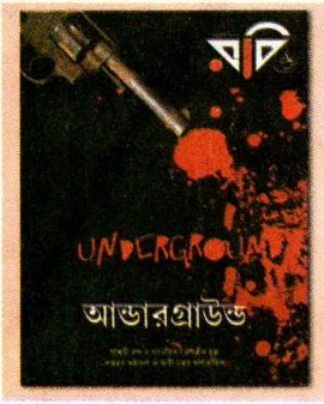

প্রতি রবিবারেই অপেক্ষায় থাকি নতুন ‘রবি’র। প্রতি সংখ্যাতেই থাকে নতুন নতুন বিষয়ের উপর প্রচ্ছদ কাহিনি। কত বিচিত্র বিষয়েই যে আপনারা কাজ করেন! আন্ডারগ্রাউন্ড বা পাতাল জগৎ নিয়েও যে আবরণ কথা হতে পারে তাও রবি এক সকালে (৩১/৩) করে দেখাল। আন্ডারওয়ার্ল্ডের কাজ কারবার নিয়ে মধ্যবিত্ত মাত্রেই রোমাঞ্চ অনুভব করে। দেশের প্রথাগত আইনকানুনকে পাশ কাটিয়ে প্রতিদিনই এক অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে নানাবিধ অবাঞ্ছনীয় ঘটনার ঘনঘটা চলতে থাকে সারা পৃথিবী জুড়ে। আমাদের দেশের অর্থের রাজধানী মুম্বইসহ সারা দেশেই পাতালজগতের ডনদের কেরামতি সমানতালে হয়েই চলে। হাজি মস্তান, দাউদ ইব্রাহিমের মতো ডনদের অসামাজিক কার্যকলাপ সংবাদমাধ্যমে প্রায়শই আলোচিত হত এক সময়। কিন্তু ‘কালো কলকাতা’ মহানগরী কলকাতার মধ্যে বিরাজ করা আন্ডাগ্রাউন্ডের হালহকিকতের যে সন্ধান দিল ‘রবি’ তা আমাদের অনেকের অজানা। আইনের বজ্র আঁটুনি থাকলেও যুগে যুগে এই অন্তর্জগতের বিনাশ তো হচ্ছেই না, বরং তা ক্রমবর্ধমান।

শুকুর আলি। চাকুন্দি। হুগলি।

‘মাসিমা, মালপো খামু’ হিট গানের মতোই সকলের মুখে মুখে ফিরত

‘রবি’র প্রচ্ছদকাহিনিতে (১৭ মার্চ) সাড়ে চুয়াত্তর ছবিটির আলোচনা পড়ে ছবিটি ডিভিড়িতে আরেকবার দেখলাম। একটু ‘আরও ভালো লাগার’ অনুভূতি হল। যখন প্রথম ছবিটি মুক্তি পায় সেবারই আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি এবং মা সেই প্রথম আমাকে সিনেমা দেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ, একমাত্র আমি বাদে বাড়ির বড়দের আর সকলেই ছবিটি দেখে এসেছেন। এবং প্রায় সব বাড়িতে মালপো তৈরির ধুম পড়েছিল। যদিও মালপো অপেক্ষা তখন জনপ্রিয় ছিল ‘লবঙ্গলতিকা’ নামের একটি মিষ্টান্ন। সাড়ে চুয়াত্তরে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘মাসিমা, মালপো খামু’ উক্তিটি তখন হিট গানের মতোই ছোট বড় সকলের মুখে উচ্চারিত হত পথেঘাটে সর্বত্র।

তখনকার দিনে প্রেমপত্র লেখার জন্য বাজারে, বইয়ের দোকানে একরকম হাল্কা নীল রঙের কাগজের সুগন্ধী প্যাড কিনতে পাওয়া যেত এবং সঙ্গে মানানসই নীল খাম। যার এককোণে খুব ছোট অক্ষরে লেখা থাকত, ‘যাও পাখি, বোলো তারে/সে যেন না ভোলে মোরে!’ খামের উল্টোদিকে ‘৭৪।।’ হাতে লিখে দিতেন প্রেরক/প্রেরিকারা। মজার কথা, আমার মতো ছোটদের হাত দিয়েই সে সব চিঠি পোস্ট করানো হত এবং কাজটা করার জন্য চকোলেট ঘুষ পাওয়া যেত। যেমন অঞ্জলিদি চকোলেট দিয়ে তিমুর হাতে চিঠি পাঠাতেন নিমাইদার কাছে (দ্রঃ ‘প্রথম প্রহর’: রমাপদ চৌধুরীর প্রথম উপন্যাস)। আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সাড়ে ৭৪ ব্যাপারটা কী? কেনই বা তা সবরকম খামের চিঠিতে লেখা হত না। পরে বড়দের মুখে গল্প (নিছকই গল্প?) শুনেছিলাম কোনও এক রাজা তাঁর অমাত্যদের দেওয়া ‘চাপরাশ’

(লিখিত আদেশ/বার্তা) গোপন রাখার জন্য অমাত্যদের সামনেই এত সংখ্যক ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়েছিলেন যে নিহতদের গলার পৈতের ওজন হয়েছিল ৭৪।। মণ (১ মণ = ৩৭.৫ কিলোগ্রাম)! এটা করা হয়েছিল এই কারণে যে অমাত্যরা চাপরাশের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করলে ওই ৭৪।। মণ পৈতের অভিসম্পাত তাঁদের ওপর লাগবে এবং সর্বনাশ হবে। এ সব গল্প এরকমই হয়ে থাকে (স্বপ্নে বিরিয়ানি রাঁধলে তাতে মশলাপাতি কম দেবেন কেন?)। কিন্তু গল্প যাই হোক, প্রেমপত্রের গোপনীয়তার প্রতীক ছিল ওই সাড়ে চুয়াত্তর। এখনকার তেলুগু/তামিল ছবি থেকে টোকা গল্প আর বলিউডের আইটেম ডান্স আর মারামারির (কু) দৃশ্য সম্বলিত বাংলা ছবির যে দশা হয়েছে তাতে ‘সাড়ে চুয়াত্তর’-এর মতো প্রকৃত হাসি/প্রেমের পরিচ্ছন্ন রুচির ছবি আর টলিউড থেকে বেরোবে— এ রকম আশাকে ‘বকাণ্ড প্রত্যাশা’ বলেই মনে হয়। বাংলা অভিধানে শব্দের এতই খরা যে বাংলা ছবির নামই এখন রাখতে হচ্ছে ইংরেজিতে! ২১ ফেব্রুয়ারির ‘ভাষা শহিদ স্মরণ’ নামক ‘ধামাকায়’ মেতে বাংলা/মাতৃভাষার জন্য চোখের জল ফেলাই সার!

নন্দদুলাল রায়চৌধুরী। বিধানপল্লী। খড়্গপুর।

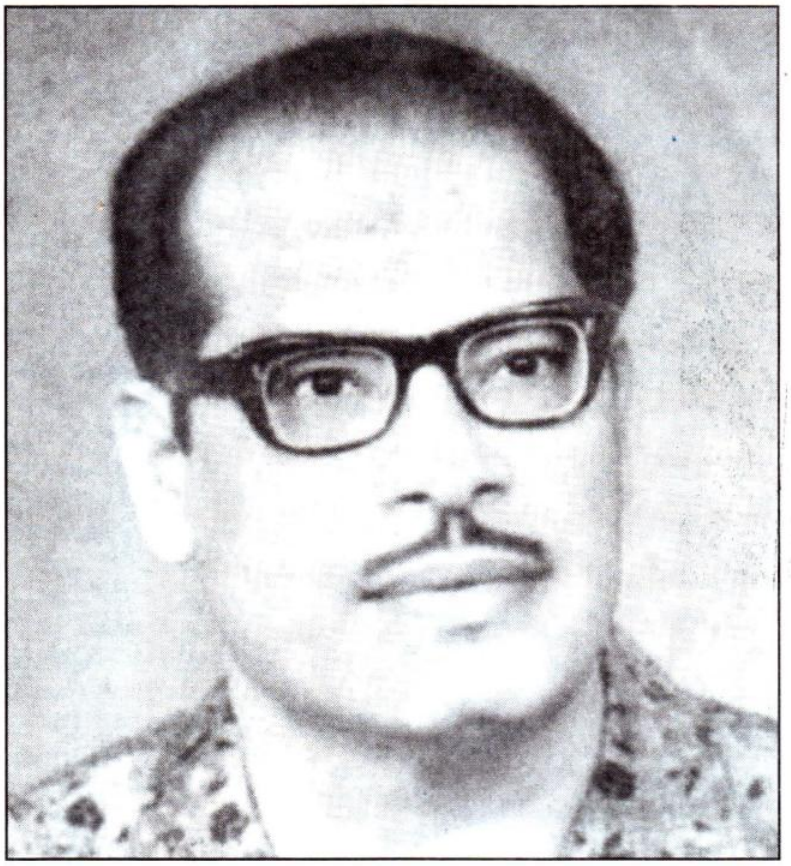

মান্না

তাঁকে দেখতে কনকনে ঠান্ডাতেও দাঁড়িয়ে থাকেন হাজার হাজার মানুষ। শুধু ভারতে নয়, সারা পৃথিবীর গানের শ্রোতামাত্রেই তাঁর কণ্ঠস্বরের মুগ্ধ অনুরাগী। অথচ চলচ্চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান চল্লিশের কোঠায়! তাঁর মতো একজন বিরাট মাপের গায়ককে এতখানি অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাবলে অবাক হতে হয়। এই উপেক্ষা ও অপেক্ষা একজন বড় শিল্পী হয়ে ওঠার জ্বালানী হয়তো আবশ্যিক ছিল। তিনি জানতেন, তাড়াহুড়োয় কোনও লাভ নেই। সময় আসবেই। রেওয়াজ এবং তালিমই তাঁর কাছে সব। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আঙ্গিকে গাওয়া গানগুলিতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা সবাই বলে থাকেন। কিন্তু ভুললে চলবে না অন্য ধারার গানও তিনি অনায়াস দক্ষতায় গেয়েছেন। তিনি মান্না দে। ভারতীয় গানের জগতের অপরিহার্য এক ঈশ্বর। এক জীবন্ত কিংবদন্তি। বর্ষীয়ান মহান এই শিল্পীকে নিয়েই এবারের 'রবি'।

মহাসিন্ধুর ওপার থেকে

মান্না দে-র সঙ্গীত শিক্ষার শুরু মূলত ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত দিয়ে। তাঁর প্রথম সঙ্গীত গুরু ছিলেন তার কাকা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণ চন্দ্র দে।

জয় চট্টোপাধ্যায়

২০০৮ -এর ডিসেম্বর। পানিহাটি উৎসব। দশ দিনের উৎসবে একদিন হাজির হবেন মান্না দে। সেদিন সকাল থেকেই মাইকে তাঁর গান। ঘন ঘন শিল্পীর নাম ঘোষণা। আর বিকেল হতে না হতেই গোটা উৎসব চত্বরের চেহারাটাই অন্যরকম। অন্যদিন যেখানে শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখার বদলে খাবার বা হাতের কাজের স্টলে বেশি ভিড় জমায় মানুষ, সেখানে মান্না দে-র নামে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই ত্রিপল থেকে চেয়ার ভর্তি! এমনকী মাঠের চারপাশে বাঁশের ঘেরাতেও ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িয়ে মানুষ। প্রথমে মঞ্চে গাইবেন রমাপ্রসাদ দেব, তারপর লোপামুদ্রা মিত্র। শেষে মান্না দে। কিন্তু

প্র চ্ছ দ

রফি বা কিশোরের আগে শুরু করলেও মান্না দে পরিচিতি পান আরও কয়েক বছর পর। কবি প্রদীপের লেখা শচীন দেব বর্মনের সুরে ছবির সেই বিখ্যাত গানটি ছিল 'উপর গঙ্গা বিশাল'। আর এর ঠিক দু'বছর পরেই বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষিক ছবি 'অমর ভুপালি'ই পাকাপাকি ভাবে তাঁকে সঙ্গীতের মহেশ্বরের স্থান করে দেয়।

সবার আগেই হাজির হয়ে যান তিনি। মঞ্চের পাশে বসে মন দিয়ে দুই নবীন শিল্পীর গানও শোনেন। তারপর রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ নিজে হারমোনিয়ামে আঙুল ছোঁয়ান। শুরুটা হয়, 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে, কী সঙ্গীত ভেসে আসে'। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের এই গানের সুরকার স্বয়ং মান্না দে-র কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে। শীতের অন্ধকার যত গভীর হয়, তত গভীর হয় স্বর ও সুর। 'এ কী অপূর্ব প্রেম দিলে বিধাতা আমায়', 'আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে', 'অভিমানে চলে যেও না', 'মা, মাগো মা', আরও কত গান। মাঝে মাঝে টুকরো কয়েকটা কথা। ঘন্টা দেড়-দুইয়ের নিস্তব্ধতা কাটে হাততালির শব্দে। বোঝা যায় পানিহাটি তখনও জেগে ৮৯ বছরের 'তরুন কণ্ঠ'-এ।

'আমি বাংলায় প্রায় আড়াই হাজারের মতো গান গেয়েছি। এবং তার সব ক'টাই এপার-ওপার দুই বাংলার মানুষই শুনেছেন।' মান্না দে-র নিজের কথায়,'যখনই আমি কোথাও গান গাইতে গিয়েছি, দেখেছি তাঁরা সবক'টা গানই শুনেছেন। শুধু শোনেননি, মনেও রেখেছেন। আমি কোনও গানের কথা ভুলে গেলে তাঁরাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। শুধু বাংলাতেই নয় বাংলার বাইরে বা বিদেশেও মানুষ খাওয়া-দাওয়া, শপিং ভুলে আমার গান শুনতে চলে এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, আপনার গানের কী যাদু রয়েছে তা আপনি নিজেই জানেন না। সত্যিই আমি অভিভূত এই ভালোবাসায়।'

চল্লিশের দশক থেকে টানা সত্তর বছর এদেশের জনপ্রিয় সংগীতের প্রতিনিধি একজন খাঁটি উত্তর কলকাতার মানুষ, প্রবোধচন্দ্র ওরফে মান্না দে। ১৯৪৩ সালে সেই অর্থে যখন তাঁর সঙ্গীত জীবন শুরু হয় তখনও ভারতীয় ছবির শৈশব কাটেনি। ১৯১৩ সালে দাদা সাহেব ফালকে-র 'রাজা হরিশচন্দ্র' মুক্তি পায়। সেই ছবি ছিল নির্বাক। টানা আঠেরো বছর শুধুমাত্র প্রেক্ষাগৃহে যন্ত্রীরা বসে আবহ তৈরি করে গিয়েছেন। গোড়াতে সেটাই ছিল 'ফিল্ম মিউজিক'। ১৯৩১-এ মুক্তি পায় আদর্শ ইরানি'র 'আলম আরা'। প্রথম সবাক ছবি। বলা যায় সেই সময় থেকেই চিত্রগীতির সলতে পাকানো শুরু। তখন অবশ্য 'নেপথ্য কণ্ঠে' নামক টাইটেল কার্ড দেখা যেত না। কারণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিজেদের গলাতেই গান গাইতেন। দেশীয় নাটক বা যাত্রার ঢঙে। ছবির প্রস্তর যুগে সংলাপ ও গান সরাসরিই রেকর্ড করতে হত। তবুও শুরু থেকেই জনপ্রিয়তার পারদ চড়তে থাকে। 'আলম আরা' ছবিতে ওয়াজির মহম্মদ খানের গলায় 'দে দে খুদা কে নাম' গানটি লোকের মুখে মুখে ফেরে। 'আলম আরা' মুক্তির একযুগ পর মান্না দে ভারতীয় ছবিতে নেপথ্য শিল্পীর কাজ শুরু করেন। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সুরে নায়িকা সুরাইয়ার সঙ্গে তাঁর প্রথম ডুয়েট। মজার কথা হল তখনও কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র সঙ্গীতের ব্রহ্মা-বিষ্ণুর জন্ম হয়নি। ডেবু করেননি মহম্মদ রফি, কিশোরকুমার। ১৯৪৪ সালে মহম্মদ রফি পাঞ্জাবি 'গুল বালোচ' ছবিতে নেপথ্য শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। আর কিশোরকুমারের প্রথম ছবির নাম 'জিদ্দি'। এই ছবিতে নায়ক দেবানন্দের গলায় কিশোরকুমারের গান ছিল 'মর নে কি দুয়ায়ে কিঁউ মাঙ্গু'। রফি বা কিশোরের আগে শুরু করলেও মান্না দে পরিচিতি পান আরও কয়েক বছর

র বি পি ডি য়া

জন্ম	১ মে ১৯১৯
আসল নাম	প্রবোধ চন্দ্র দে
বাবা	পূর্ণচন্দ্র দে
মা	মহামায়া দে
স্কুল	স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল
কলেজ	স্কটিশ চার্চ কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ
সঙ্গীত শিক্ষা	কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে। পরবর্তী সময়ে শচীন দেব বর্মন, আরও পরে উস্তাদ আমন আলি খান ও উস্তাদ আব্দুল রহমান খান
বিয়ে	সুলোচনা কুমারণ
সন্তান	সুরমা, সুমিতা
প্রথম প্লেব্যাক	'তমন্না' ছবিতে ১৯৪৩ সালে, সুরাইয়ার সঙ্গে ডুয়েট
প্রথম জাতীয় পুরস্কার	১৯৬৯ সালে 'মেরে হুজুর' ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ প্লেব্যাক গায়ক
পুরস্কার	অসংখ্য পুরস্কারে সম্মানিত। জাতীয় পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ছাড়াও আরও নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। ১৯৭১ সালে পেয়েছেন পদ্মশ্রী। ২০০৫ সালে পদ্মভূষণ। ২০০৭ সালে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার। গত বছর পেয়েছেন বঙ্গ-বিভূষণ। এ বছরের বাংলা সঙ্গীত মেলায় পেয়েছেন বিশেষ সঙ্গীত মহাসম্মান
রেকর্ড করা গানের সংখ্যা	প্রায় সাড়ে তিন হাজারের ওপরে

গুরু ও শিষ্য। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র সঙ্গে মান্না দে

শচীন দেব বর্মন।

পর। ১৯৫০ সালে 'মশাল' ছবি থেকে। কবি প্রদীপের লেখা শচীন দেব বর্মনের সুরে ছবির সেই বিখ্যাত গানটি ছিল 'উপর গঙ্গা বিশাল'। আর এর ঠিক দু'বছর পরেই বাংলা-হিন্দি দ্বিভাষিক ছবি 'অমর ভুপালি'ই পাকাপাকি ভাবে তাঁকে সঙ্গীতের মহেশ্বরের স্থান করে দেয়।

মান্না দে-র সঙ্গীত শিক্ষার শুরু মূলত ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত দিয়ে। কলেজ জীবনে তাঁর প্রথম সঙ্গীত গুরু ছিলেন তার কাকা সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণ চন্দ্র দে। আর তাঁর সঙ্গে উস্তাদ দাবির খাঁ। পরে ১৯৪২ সালে কাকার সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে বম্বেতে পাকাপাকি ভাবে আসার পরও উস্তাদ আমন আলি খাঁ ও উস্তাদ আবদুল রহমান খাঁ-র কাছে হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা নেন তিনি। অনিল বিশ্বাস, নৌসাদ , শঙ্কর-জয়কিষনের মতো অনেক সঙ্গীত পরিচালকই তাই যখন ছবির গানে মার্গ সঙ্গীতের ছোঁয়া দিয়েছেন তখনই মান্না দে-র কণ্ঠ ব্যাবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে দরবারি কানাড়াতে 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে'-র মতো গান মনে পড়ে যাচ্ছে। তবুও শিল্পীর নিজের প্রিয় গানের তালিকা ঘাঁটলে দেখা যাবে মনোজ কুমারের 'উপকার' (১৯৬৭) ছবির 'কসমে ওয়াদে প্যায়ার বফা' বা হেমেন গুপ্তের 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৬১) ছবির 'অ্যায় মেরে প্যায়ারে বতন'-এর মতো গানও রয়েছে। এই ধরনের গানের অনুপ্রেরণা হিসেবে তিনি সেই কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কথাই বার বার স্বীকার করেন।

মান্না দে-র ভাষায়,' গুরু হিসেবে আমার কাকা ছিলেন খুব কড়া। কিন্তু মানুষ হিসেবে কঠিন ছিলেন না। যেদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম গায়ক হব, সেদিন তিনিই সবথেকে বেশি খুশি

■ সুদেব দে (সঙ্গীত শিল্পী)

মান্না দে আমার সেজো কাকা হন। আমি নিজেও একজন সঙ্গীতশিল্পী। আমার বাবা প্রণব দে-ও ছিলেন একজন গায়ক। আমি যখন জন্মাই তখনই সেজো কাকা ভারত বিখ্যাত শিল্পী। কিন্তু সে বয়সে অত শত বুঝিনি। এটুকু বলতে পারি, পারিবারিক ভাবেই গান আমাদের কয়েক প্রজন্মের প্রধান পরিচয়। সেই কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র আমল থেকে। আমাদের পরিবারের নিয়ম হল স্কুলের পড়াশুনো শেষ না করে অর্থাৎ একটি পর্যায়ে শিক্ষিত না হলে গান শেখা যাবে না। যদিও স্কুলে পড়ার সময় থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্য মতো আমি গান গাইতাম। কিন্তু প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষা শুরু হয় মাধ্যমিক পাশ করার পরে। মান্না দে'কে নিজের সেজো কাকা হিসেবে যেমন পেয়েছি তেমনই পেয়েছি একজন সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবেও। যদিও আমার বাবা প্রণব দে-র কাছেও আমি গান শিখেছি। ব্যক্তিগত ভাবে জানা থেকে বলতে পারি, প্রতিনিয়ত গান শেখার চেষ্টা করাই ছিল সেজো কাকার প্রধান কথা। কাকা নিয়মিত রেওয়াজ করতেন। সমায়ানুবর্তিতা আজও দেখার মতো। তিনি যেমন গুরু, তেমনই কাকা হিসেবেও আমি তার অকুণ্ঠ স্নেহ পেয়েছি। আমরা কলকাতার বাড়িতে থাকতাম, কাকা তখন অধিকাংশ সময় থাকত বম্বেতে। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে কাকার আগমন মানেই একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। ছোটদের বকাবকি করা একদম পছন্দ করতেন না তিনি। কাকার সুরে 'দময়ন্তী দময়ন্তী' গানটির জন্য পুরস্কার পেয়েছিলাম আমি।

■ ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত (সঙ্গীত পরিচালক)

মান্না দে-র মতো বিরাট মাপের শিল্পী সম্পর্কে বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমি ক্ষুদ্র একজন মানুষ। মান্না দে- মহম্মদ রফি- কিশোর কুমার, এঁরা প্রত্যেকেই এক একজন মহীরুহ। মান্না দে-র সম্পর্কে যাই বলি কম বলা হবে। তাঁর অনুশীলন , তাঁর গায়কী তাঁকে মান্না দে করেছে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতর উপর তার দখল তাঁকে এতখানি অনায়াস শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই দক্ষতাকে তিনি একজন প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসাবে কাজে লাগিয়েছেন। তথাপি গানের ইমোশনাল কোয়ালিটিকে কখনও নষ্ট হতে দেননি। মান্না দের গান শুনেই আমরা বড় হয়েছি। আমি মনে করি পরম শ্রদ্ধেয় এই শিল্পী আজকের দিনেও যুগোপযোগী। এই সময় গাইলেও তিনি নিঃসন্দেহে সফল হতেন।

প্র চ্ছ দ

হিন্দিতে যদি রফি বা কিশোর হন, তাহলে বলতে হয় বাংলাতে হেমন্ত যুগেও মান্না দে ছিলেন সমান জনপ্রিয়। সম্ভবত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের থেকেও বেশি তাঁর জনপ্রিয় গান রয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমারের কণ্ঠে। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির 'আমি যে জলসাঘরে'ই হোক বা 'সন্ন্যাসী রাজা'র ছবি 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও'।

হয়েছিলন। এমনকী আমাকে একটা তানপুরাও এনে দিয়েছিলেন সঙ্গীত চর্চার জন্য। তা বলে আমাকে বক্সিং, কুস্তি বা ঘুড়ি ওড়াতে কখনও বারণ করেননি। তিনি সবসময়ই অন্য গুরুদের মতো আমাকে 'শুধুই ছাত্র' ভাবতেন না। তিনি আমাকে সন্তানের মতো ভালবাসতেন এবং চাইতেন সেই ভালবাসা দিয়েই আমি গানটা করি। সাধারণের মধ্যে আমার কাকার গান জনপ্রিয় ছিল। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা নিয়েছিলেন। ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা, গজল সব ধরনের গানই গাইতে পারতেন। কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন সাধারণের গান। এটাই ছিল তাঁর 'মাস্টার স্ট্রোক'। মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম, তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ছেড়ে এ ধরনের গান কেন বেছে নিলেন। পরে বুঝেছি, সেই সময়ে যখন অনেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চা করছেন, তখন সাধারণ শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মতো গান কেউ গাইছেন না। ফলে সেই রাস্তাতে হেঁটেই তিনি জনপ্রিয় হয়েছিলন। ফলে হিন্দি ছবি ও থিয়েটারে নেপথ্যে কাজ শুরু করার পরই তাঁর জনপ্রিয়তা গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমার মনে আছে একবার করাচিতে তাঁর সঙ্গে 'বাবা মন কি আঁখে খোল' এবং 'তেরি গটরি মে লাগা চোর মুসাফির' গান দুটো গাওয়ার পর আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম দর্শকদের মধ্যে উৎসাহ দেখে। এই জন্য পরে আমারও এই ধরনের গান গাওয়ার উৎসাহ বাড়ে।'

একদিকে মহম্মদ রফি, অন্যদিকে কিশোরকুমার। হিন্দি ছবির দুই মহীরুহের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই নিজেকে মহীরুহ করে তুলেছিলেন মান্না দে। শিল্পী সত্তার সংঘাত নিয়ে বাজারি গল্প থাকলেও মান্না দে-র জীবনে বোধহয় সেটা নেহাতই অমূলক। কারণ মহম্মদ রফির সঙ্গেই তাঁর ডুয়েট গানের সংখ্যা নয় নয় করে প্রায় ষাট! তার মধ্যে পি এল সন্তোষির 'বরসাত কি রাত' (১৯৬০) ছবিতে 'ইশক ইশক', আর কে রাখান-এর 'কল্পনা' (১৯৬০) ছবিতে 'তুহি মেরা প্রেম দেবতা', এস ব্যানার্জির 'পরভরিশ'(১৯৫৮) ছবিতে 'মামা ও মামা' গানগুলো বেশ জনপ্রিয়ও। একই ভাবে কিশোরকুমারের সঙ্গে জ্যোতি স্বরূপের 'পড়োসন' (১৯৬৮) ছবিতে 'এক চতুর নার করকে সিঙ্গার' বা রমেশ সিপ্পির 'শোলে'(১৯৭৫) ছবিতে 'ইয়ে দোস্তি'র কথা মনে করা যেতে পারে। 'ওঁদের গলা ঈশ্বর প্রদত্ত।' মান্না দে নিজে বলেছেন, 'আমাকে পরিশ্রম করে সেই ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছোতে হয়েছে। আমি খুশি। কারণ সেই কষ্টের ফলেই এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি।'

লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলের সঙ্গেও গান করেছেন মান্না দে। লতার সঙ্গে তাঁর ডুয়েটের সংখ্যাটা ১১৩-র মতো। রাজকাপুর-নার্গিস জুটির অনেক জনপ্রিয় গানই রয়েছে যা তাঁরা

দুজনে গেয়েছেন। একটু মনে করলেই 'ইয়ে রাত ভিগি ভিগি' (চোরি চোরি, ১৯৫৮), 'প্যায়ার হুয়া ইকরার হুয়া' (শ্রী -৪২০, ১৯৫৫), 'আজা সনম মধুর চাঁদনি মে হাম' (চোরি চোরি, ১৯৫৮) এর মতো গানগুলো এই সময়ে দাঁড়িয়েও যে কেউ মনে করতে পারবেন।

হিন্দিতে যদি রফি বা কিশোর হন, তাহলে বলতে হয় বাংলাতে হেমন্ত যুগেও মান্না দে ছিলেন সমান জনপ্রিয়। সম্ভবত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের থেকেও বেশি তাঁর জনপ্রিয় গান রয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমারের কণ্ঠে। 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি' ছবির 'আমি যে জলসাঘরে'ই হোক বা 'সন্ন্যাসী রাজা'র ছবি 'কাহারবা নয় দাদরা বাজাও' কিংবা 'ছদ্মবেশী' ছবির 'আমি কোন পথে যে চলি' বা 'শঙ্খবেলা' ছবির 'কে প্রথম কাছে এসেছি'। সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ, রতু মুখোপাধ্যায়, সুপর্ণকান্তি ঘোষের মতো সুরকাররা বার বার ছবির গানে ব্যবহার করেছেন মান্না দে'র কণ্ঠ।

ছবির গান ছেড়ে দিলেও বাংলা আধুনিক গানেও এইসব সুরকাররা এই স্বর্ণকণ্ঠকে শব্দে-সুরে বসিয়েছেন। 'অভিমানে চলে যেও না', 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা', 'চার দেওয়ালের মধ্যে নানান', 'যদি কাগজে লেখো নাম' এরকম অজস্র গান তাই আজ এফএম-এর রেট্রো স্টেশনগুলোতে শুধু নয় জেনারেশন ওয়াইয়ের মোবাইলেও খুঁজলে পাওয়া যাবে।

একজন শিল্পী যিনি আধুনিক, চলচ্চিত্র সঙ্গীতের পাশাপাশি নজরুল, দ্বিজেন্দ্রগীতি রবীন্দ্র গানেও সমান সাবলীল। সাড়ে তিন হাজার শব্দ-সুরে জড়িয়ে থাকা সেই কিংবদন্তি আজ ৯৩ বছরেও রেকর্ডিং স্টুডিওর দরজা খুলে দাঁড়ান! কানে হেডফোন লাগিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে সেই না ভোলা স্বরকে নিয়ে, সুরের ঈশ্বরের কাছে। তিনি মান্না দে। শুধুই মান্না দে। ❖

কিংবদন্তি সাধক শিল্পী

কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র মতো সুরসম্রাট গায়ক ছিলেন তাঁর আপন কাকা। কাছ থেকে শিখেছেন কী ভাবে নিজেকে মেজে ঘষে তৈরি করতে হয়। রেওয়াজ, তালিম আর সঙ্গীত শিক্ষাই মান্না দে'র সঙ্গীত জীবনের সব কথা ছিল।

দেবজ্যোতি মিশ্র

মান্না দে একজন সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। একজন অসম্ভব মেধা এবং মননের মিশেলে তৈরি গাইয়ে। তাঁর গানের রেওয়াজ বা তালিম ছিল দেখবার মতো। কিন্তু তিনি শুধু একজন দক্ষ গায়কই ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন এক দরদী শিল্পী। আমার মনে হয়, মান্না দে-কে দেখে যেটা প্রথমেই সকলের শেখা উচিত তা হল তাঁর অসীম ধৈর্যশীলতা। এ কথা বলছি কারণ অনেকেই জানেন না শিল্পী জীবন তিনি শুরু করেছিলেন সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে। যে সে সঙ্গীত পরিচালকের সহকারী নয়, প্রথমে

বিভিন্ন ধরনের গান শিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গানের তালিম নিয়েছেন পরম নিষ্ঠায়। গানের কথাকে মান্না দে যে উচ্চতায় উচ্চারণ করতে পারতেন তা এই সব যাবতীয় শিক্ষার ফলাফল। চাইলেই তো আর এত বড় মাপের একজন গায়ক হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য লাগে অধ্যবসায়, নিয়মিত চর্চা।

কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং তারপর শচীন দেব বর্মনের মতো মহান সঙ্গীত পরিচালকের সহকারী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন তিনি।

চোখের সামনে দেখেছিলেন প্রায় তাঁরই সমবয়সি কিশোরকুমার বা মহম্মদ রফির মতো গায়কদের দাপট। ততদিনে কিন্তু তাঁরা হিন্দি চলচ্চিত্রের প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে বিরাট নাম করে ফেলেছেন। প্লে ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আত্মপ্রকাশ অনেক আগে হলেও যাকে বলে ব্যস্ত গায়ক তা মান্না দে-র জীবনে ঘটে বহু পরে। অবশেষে চল্লিশের কোঠায় যখন তাঁর বয়স, তখন চলচ্চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিয়মিত সুযোগ পেতে শুরু করলেন তিনি। মান্না দে'র মতো একজন বিরাট মাপের গায়ককে এতখানি অপেক্ষা করতে হয়েছিল ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। তার চেয়েও বড় কথা দীর্ঘ উপেক্ষার পরেও সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে তিনি মরতে দেননি কখনও। কেন না তিনি জানতেন, তাড়াহুড়োয় কোনও লাভ নেই। সময় একদিন আসবেই।

কৃষ্ণ চন্দ্র দে'র মতো সুরসম্রাট গায়ক ছিলেন তাঁর আপন কাকা। কাছ থেকে শিখেছেন কীভাবে নিজেকে মেজে ঘষে তৈরি করতে হয়। রেওয়াজ আর তালিম আর সঙ্গীত শিক্ষাটাই যে একজন সঙ্গীত শিল্পীর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিত, মান্না দে'র সঙ্গীত জীবনকে দেখলে এই কথাই মনে হয়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো তথাকথিত জনপ্রিয় কণ্ঠস্বর ছিল না তাঁর। তথাপি সমকালীন সঙ্গীত জগতে নিজের আসনটি তিনি যথাযোগ্য ক্ষমতায় পেয়েও গিয়েছিলেন। এর জন্য নিরন্তর লড়তে হয়েছিল তাঁকে। শুধু প্রতিভা নয়, দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়েছিল সঙ্গীতের নিষ্ঠাবান একজন ছাত্রের মতো।

প্লে ব্যাকের প্রবাদপ্রতিম। কিশোর-রফি-মান্না

গায়কীর গভীরতা বাড়ানোর জন্য উর্দু ও হিন্দির মতো বিভিন্ন ভাষাগুলিকে আরও ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন মান্না দে। বিভিন্ন ধরনের গান শিখেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার গানের তালিম নিয়েছেন পরম নিষ্ঠায়। গানের কথাকে মান্না দে যে উচ্চতায় উচ্চারণ করতে পারতেন তা এই সব যাবতীয় শিক্ষার ফলাফল। চাইলেই তো আর এত বড় মাপের একজন গায়ক হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য লাগে অধ্যবসায়, নিয়মিত চর্চা। মান্না দে এই নিরন্তর অধ্যবসায়েরই ফসল।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিংবদন্তী গায়ক হওয়ার পথে তাঁকে বহু পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। সহজ

‘পড়োসনে’র এই বিখ্যাত গানটিতে ছবিতে লিপ দিয়েছিলেন মেহমুদের মতো তথাকথিত কমেডি শিল্পী। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় মান্না দে সেখানেও মানিয়ে যান। একেই বলে প্রকৃত ভার্সাটাইল সিঙ্গার।

ছিল না সেই রাস্তা। মনে রাখতে হবে তিনি যখন প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসেবে গাইছেন সেই একই সময়ে রয়েছেন কিশোর রফি বা মুকেশের মতো দিকপাল সব কণ্ঠ শিল্পীরা। ধারে ও ভারে যাঁরা কেউই কারও থেকে কম যান না।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আঙ্গিকে গাওয়া গানগুলিতে মান্না দে-র শ্রেষ্ঠত্বের কথা সবাই বলে থাকেন, কিন্তু ভুললে চলবে না ‘পড়োসন’ ছবিতে ‘এক চতুর নার’-এর মতো অন্য ধারার গানও তিনি অনায়াস দক্ষতায় গেয়ে দিয়েছেন। ‘পড়োসনে’র এই বিখ্যাত গানটিতে ছবিতে লিপ দিয়েছিলেন মেহমুদের মতো তথাকথিত কমেডি শিল্পী। কিন্তু আশ্চর্য দক্ষতায় মান্না দে সেখানেও মানিয়ে যান। একেই বলে প্রকৃত ভার্সাটাইল সিঙ্গার। এর পাশাপাশি বাংলা ছবিতে বিশেষত সত্তরের দশকে যে নতুন ধারার ছবি হতে শুরু করল সেখানেও মান্না দে নিজেকে প্রমাণ করলেন। সুধীন দাশগুপ্তের সুরে ‘হয়তো তোমারই জন্য’ বা ‘কে তুমি নন্দিনী’র মতো পাড়ার রকবাজ ছেলের কণ্ঠস্বরেও তাঁকে কী সাবলীল লাগে!

এখানেই একজন মহৎ শিল্পীর আঁচড়ের দাগ— ছবির চরিত্র উপযোগী করে নেন মান্না দে নিজেকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে তাঁর অসম্ভব দখলের কথা আমরা ভুলে যাই তখন। সৌমিত্র ‘টুইস্ট’ নাচতে নাচতে যখন ‘কে তুমি নন্দিনী’ গেয়ে ওঠে তখন অন্য এক মান্না দে’র সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের। নিজেকে কিংবদন্তী শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এমন দক্ষতাই লাগে। যা মান্না দে’র ছিল নিশ্চিত ভাবেই। বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত গায়ক হওয়ার পরেও সঙ্গীতের সাধনার কথা তিনি ভুলে যাননি কখনও। রেওয়াজ এবং তালিমই মান্না দে’র কাছে জীবনের সব। ক্রাইসিস অর্থাৎ উপেক্ষা ও অপেক্ষা একজন বড় শিল্পী হয়ে ওঠার জ্বালানী হিসেবে প্রয়োজন। চল্লিশ বছর অবধি ওই অপেক্ষা তাঁকে শিখিয়েছিল শিল্পী জীবনের দৌড় আসলে ম্যারাথন রেস। সংগ্রাম, সাধনা আর ধৈর্য থাকলে যে সাফল্য আসে মান্না দে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ। নিজেকে নিরন্তর ঘষে মেজে আজকের এই স্থানে পৌঁছেছেন মান্না দে। অনুশীলন এবং অনুশীলনই হল মান্না দে হওয়ার একমাত্র মূল মন্ত্র।

শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাই যে, কিছু মানুষ জন্মসূত্রে শিল্পীসত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা অনেকেই তেমন পরিমানে প্রথাগত তালিম না পেলেও বড় শিল্পী হয়ে ওঠেন কালের নিয়মে। অনেকে আবার বড় শিল্পী হয়ে ওঠেন অনুশীলন ও অধ্যাবসায়ের মধ্য দিয়ে। আমি মনে করি মান্না দে এই দ্বিতীয় ঘরানায় পড়েন। সহজাত শিল্পী না হয়েও নিজেকে শেষ পর্যন্ত এই মাপে উন্নীত করা খুব সহজ কথা নয়। ❖

অনুলিখন : কিশোর ঘোষ

তিনি আন্তর্জাতিকও

২০১১-র ডিসেম্বর মাস। জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে ঢাকায়। কিন্তু তাতে কী? এরই মধ্যে হাজারে হাজারে লোক জড়ো হয়ে গেছে এখানে। অনুষ্ঠান শুরুর আরও এক ঘণ্টা তখনও বাকি। সবাই যে টিকিট কাটতে পেরেছে তা নয়।

অরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

দাঁড়িয়ে আছি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের বাইরে। ২০১১-র ডিসেম্বর মাস। জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে ঢাকায়। কিন্তু তাতে কী? এরই মধ্যে হাজারে হাজারে লোক জড়ো হয়ে গেছে এখানে। অনুষ্ঠান শুরুর আরও এক ঘণ্টা তখনও বাকি। সবাই যে টিকিট কাটতে পেরেছে তা নয়। তবু ভারতের কিংবদন্তি শিল্পী, প্রাণের গায়ক মান্না দে-কে অন্তত একবার চোখের দেখা দেখতে এসেছেন অনেকেই। তাঁদেরই একজন চব্বিশ বছরের যুবক রফিকুল বারি বললেন, 'আয়োজকরা টিকিটের দাম রেখেছেন চার হাজার টাকা, ফলে কিনতে পারি নাই।

কিন্তু ছোটবেলা থেকে ওনার গানের আমি খুব ফ্যান। তাই আসছি, যদি সুযোগ পাই একটা অটোগ্রাফ নেব।' বাহাত্তর বছর বয়সি প্রবীণ দেলওয়ার হোসেন আমিন সাহেবের হাতে অনুষ্ঠানের টিকিট। তাঁর কথায় 'মান্না দে কোনও দেশের শিল্পী না। উনি আমাদের সকলের। কত স্মৃতি যে জড়ায়্যা আছে ওনার গানের সঙ্গে তা বলে শেষ করা যাবে না।' সমস্ত প্রজন্মের, সব বয়সের শ্রোতার কাছে এই অনবদ্য শিল্পীর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কারও মনেই কোনও প্রশ্ন বা দ্বিধা থাকতে পারে কি? পাঠককে জানিয়ে রাখি, সেদিন ছ'হাজারেরও বেশি শ্রোতা অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছিলেন। বাইরে অপেক্ষারত সই-শিকারি, গুণমুগ্ধ অসংখ্য মানুষকে সামলাতে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল ঢাকা শহরের পুলিশ। এমন করে কেউ গান গাইতে পারেন? স্মরণাতীত কালে আমার জানিয়েছিলেন আমার এক আত্মীয়। মান্না দে-কে সেখানেও একবার কাছ থেকে দেখার জন্য অসংখ্য ভক্তের ভিড় হয়েছিল, ছিল বিপুল সইশিকারির দলও।

এত জনপ্রিয়তার কারণ খুঁজতে হলে প্রথমেই বলব, গান শুধু গান নয়, যা মানুষকে সুরে ও কথায় কিছুক্ষণ স্বস্তি দেবে, আনন্দ দেবে। তার সঙ্গে সঙ্গে গান জড়িয়ে যাবে মানুষের স্মৃতিতে। আর স্মৃতি সততই বেদনার। বয়স যত বাড়ে তত ফেলে আসা দিনগুলো দীর্ঘ হতে থাকে। আর গান হয়ে থাকে সেতু যার এপাশে বর্তমান, ওপাশে অতীত। বাংলাদেশে যে শ্রোতাদের আবেগঘন হয়ে যেতে দেখেছিলাম তাঁরা নিশ্চিতই ঝুঁকে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের অতীত দিনগুলোকে। শিল্পীকে কাছে পাওয়ার মাধ্যমে জানিয়েছিলেন সেই কৃতজ্ঞতা, সেই ভালোবাসা।

মান্না দে সেই উচুঁদরের শিল্পী-গায়ক, যাঁকে আলাদা করে

গায়ক ও পরিচালক। মান্না দে এবং তপন সিংহ

এরকম অভিজ্ঞতা ছিল না। দর্শক, শ্রোতারা অনেকেই দেখা গেল চোখ মুছছেন। কিন্তু গান থেমে থাকল না।

উনিশ শো উনিশের পয়লা মে অবিভক্ত ভারতে জন্ম গ্রহণ করেন এই মহান শিল্পী। যাঁর এখনও পর্যন্ত রেকর্ড করা গানের সংখ্যা তিন হাজার পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় গানের জগতেই শুধু নয় তিনি বিশ্বে জীবিত কিংবদন্তি গায়কদের অন্যতম। তাঁর গায়কি, তাঁর গানের প্রতি দরদ পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে, যে কোনও ভাষার মানুষকে আকর্ষণ করে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ২০০৬ সালের ৪ আগস্ট আমেরিকার লস এঞ্জেলসের অ্যানাহেইমে (Anaheim) লা মিরাডা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে উপচে পড়েছিল মানুষের ভিড়। ফোনে সেকথা হতে হয়নি সমাজ সচেতন অথবা প্রতিবাদী কোনও চরিত্র। কিন্তু বাংলা গানে তাঁর অবদানের জন্যেই আমরা ঋণী হয়ে থাকব, যা আমাদের চিন্তা ও মননকে সুস্থ রেখেছে, সমৃদ্ধ করেছে।

১৯৭১ সালে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও নচিকেতা ঘোষের সুরে তিনি প্রথম গেয়েছিলেন, 'ক' কোটী চোখের জল ফেলেছ যে তুমি ভালোবাসবে?' আমরা জানি সে সময় বাঙালির মুক্ত চিন্তার জগৎ, বাঙালির জীবন দু'বাংলাতেই আক্রান্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল। এখন বলুন তো কে দেগে দিতে পারে, এই গানটি শুধু প্রেম-বিরহেরই গান? ওই সময় প্রকাশিত এই গান মানুষকে নিশ্চিতই ছুঁয়েছিল সেই সময়ের আনন্দ বেদনার বেলাচলে।

এখনও বাংলাদেশে যে ক'জন শিল্পীর গানের সিডি, ভীষণ ভালো বিক্রি হয় মান্না দে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য! তাঁর অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইচ্ছে করলেই ইউটিউবে দেখতে ও শুনতে পারব আর আমাদের নজর এড়াবে না যে, কোনও কোনও গানের রেকর্ডিং দেখেছেন ও শুনেছেন প্রায় সাত লক্ষ দর্শক শ্রোতা!

বাংলাদেশে বর্তমান মিউজিক কোম্পানিগুলো প্রবলভাবে ধুঁকছে। তেমন উৎকর্ষ গান সচরাচর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, এই ভাষাতেই দুঃখ করে বলছিলেন আমাদের এক সমসাময়িক সাংবাদিক বন্ধু শিমুল সালাউদ্দিন। কিন্তু আমরা এও জানতে পেরেছি তাঁর কাছে, যে এখনও বাংলাদেশে যে ক'জন শিল্পীর গানের সিডি, ভীষণ ভালো বিক্রি হয় মান্না দে তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য! তাঁর গান নিয়ে আলোচনা পড়া অথবা অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইচ্ছে করলেই ইউটিউবে দেখতে ও শুনতে পারব আর এটাও আমাদের নজর এড়াবে না যে, কোনও কোনও গানের ভিডিও বা রেকর্ডিং দেখেছেন ও শুনেছেন প্রায় সাত লক্ষ দর্শক শ্রোতা! এই জনপ্রিয়তা এসেছে তাঁর গানের প্রতি গভীর আস্থা ও নির্বিকল্প শিল্পবোধের ভিত্তি থেকেই।

১৯৭৪ সালে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ও নচিকেতা ঘোষের সুরে তিনি রেকর্ড করেন 'আমার ভালোবাসার রাজ প্রাসাদে' গানটি। গানটির এক জায়গায় রয়েছে 'দেখি মুকুটটা তো পড়ে আছে, রাজাই শুধু নেই'। এই গানের সুর ও কথা মানুষের অন্তর্জগতের করুণ বেদনারসে সিক্ত। কিন্তু আমরা যদি ভালো করে লক্ষ করি, তাকাই ওই সমসাময়িক ইতিহাসের দিকে, তাহলে এর অন্য একটা দিকও হয়তো পাব। ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য একটা চরম দুর্ভাগ্যজনক দিন।

শেখ মুজিবর রহমান সহ তাঁর পরিবারের প্রায় সব সদস্যদেরকেই এই দিনে আততায়ীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মিত্র রাষ্ট্র ভারতের স্বাধীনতা দিবসে পাক-মদত পুষ্ট গুপ্ত ঘাতকদের এই নারকীয় হত্যালীলায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা পৃথিবী।

মাত্র ৭১ সালে স্বাধীনতা পাওয়া নব্য রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তথা জাতির জনককে হত্যার পর ভালোবাসার দেশ, ভালোবাসার রাজপ্রাসাদ তো খা খা করবেই, 'নিশুতি রাত গুমরে' কাঁদবেই। এটাই তো স্বাভাবিক। বেদনাদায়ক ঘটনাটির এক বছর আগেই যেন তার খানিক পূর্বানুমান মিশে ছিল এই গানে। অন্তত বাংলাদেশের মান্না প্রেমিকদের তাই মনে হয়েছিল।

মান্না দে-র গাওয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গানগুলোর একটা 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'। যা ১৯৮৩ সালে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় ও সুপর্ণ কান্তি ঘোষের সুরে প্রথম রেকর্ড করা হয়। গানটিতে পুরোনো দিনের হারিয়ে যাওয়া, বন্ধু বিচ্ছেদ, সংস্কৃতি লোপাট হওয়া আর বহমান জীবনের কথা আছে। গানটি ব্যাপক ভাবে হিট হয়েছিল সেই সময়। শুধু কি এই জন্য যে, গানটি স্মৃতিময় ও শ্রুতিমধুর? নাকি এই জন্যও যে, সে সময় ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাতেও ধেয়ে আসছিল নব্বই দশকের মুক্তবাজার অর্থনীতি? যা আসলে আগামী দিনে আমূল বদলে দেবে সমাজকে, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে। আসলে একটা স্বার্থক শিল্পকর্মের পেছনে তার স্থান-কালও সহায়তা করে। মানুষ যা সবসময় ভেবে উঠতে পারে না, কিন্তু

তারপরও গভীরে সেই কারণ থেকে যায়।

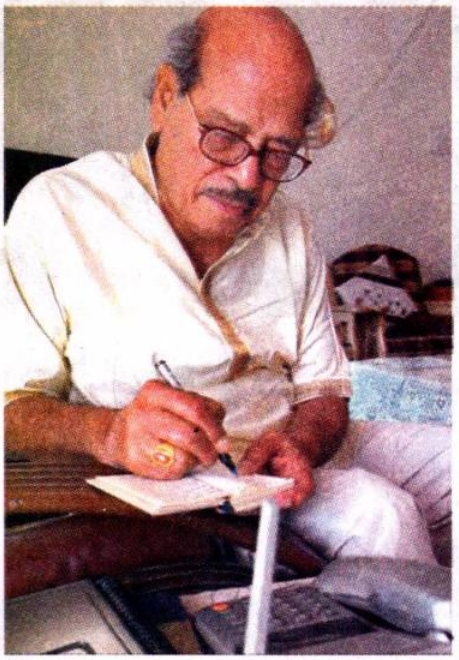

মান্না দে খুব সচেতন ভাবেই তাঁর শিল্পের কাজ গুলো করে গেছেন। রেওয়াজ তাঁকে আরও ধারালো করে দিয়েছিল। আমরা যারা তাঁর দেশবিদেশের অসংখ্য অগণিত শ্রোতাভক্ত, সেই আমরা তাঁকে ভালোবাসা জানাতে, অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে সমবেত হয়েছি লাইভ কোনও অনুষ্ঠানে অথবা নতুন সিডি কিনতে ছুটেছি মিউজিক স্টোর গুলোতে।

তাই বলতেই পারি বিশ্বজোড়া এই প্রবল খ্যাতি বুঝি এই শিল্পীর জন্মগত অধিকার! ❖

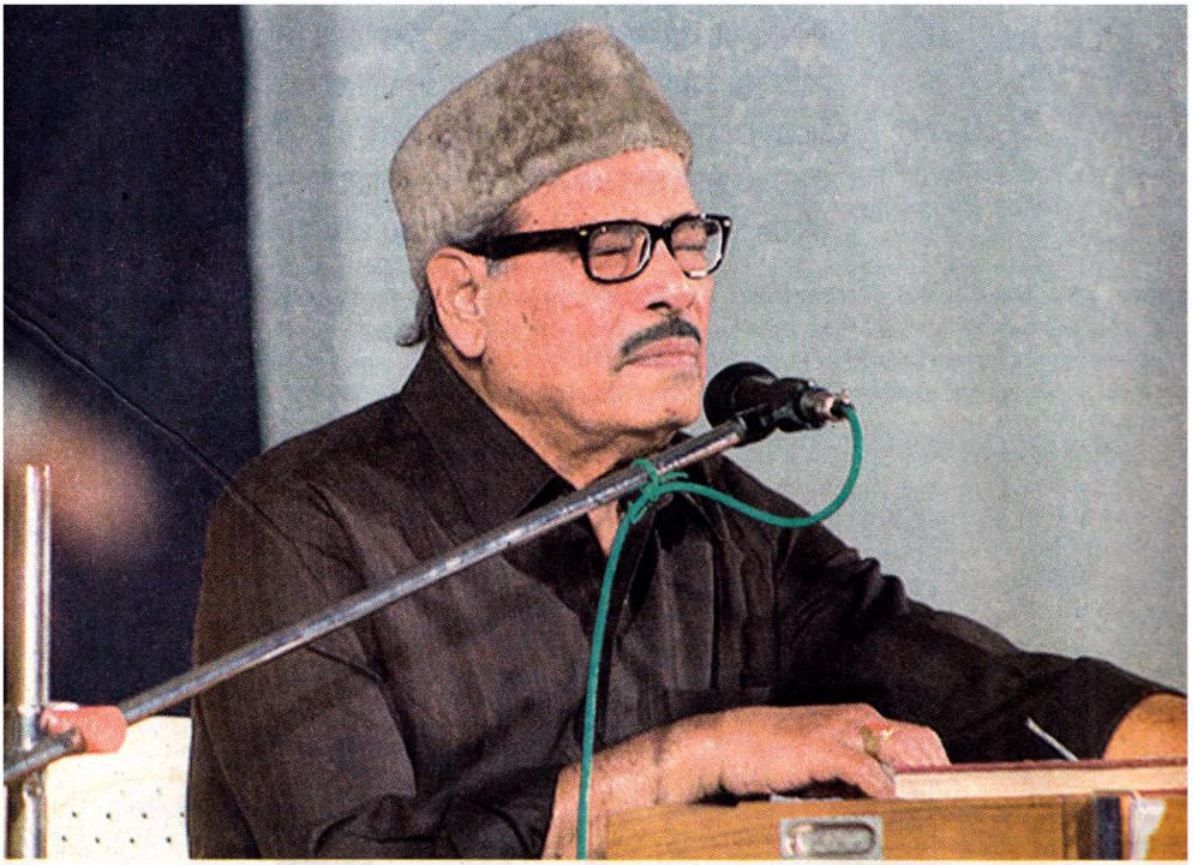

‘হি ইজ অল-ইন-ওয়ান’

মান্না দে-র আত্মজন, নচিকেতা ঘোষের পুত্র এবং মান্না দে-র বিখ্যাত গান ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা’-র সার্থক সুরস্রষ্টা সুপর্ণকান্তি ঘোষ-এর সঙ্গে মান্না দে-র স্মৃতি ও সাহচর্য নিয়ে আলাপ করলেন নিবেদিতা দে।

প্রবোধ চন্দ্র দে, ডাকনাম মান্না দে। যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের গানের ভুবনে সর্বকালের অন্যতম সেরা গায়ক হিসেবে পরিচিত। সঙ্গীতবোদ্ধা থেকে সর্বস্তরের শ্রোতা সকলের কাছেই মান্না দে একজন জনপ্রিয় এবং সফল সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব। সঙ্গীত জগতে এই অসামান্য অবদানের জন্য তাঁর ঝুলিতে রয়েছে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণও। সঙ্গীত ভুবনের এই অসাধারণ মানুষটির খুব কাছের মানুষ বাংলার আর এক শক্তিশালী সুরকার নচিকেতা ঘোষের ছেলে সুপর্ণকান্তি ঘোষ। ছেলেবেলা থেকেই মান্না দে-কে মান্না কাকু হিসাবে সম্বোধন করে আসছেন সুপর্ণবাবু। মান্নাকাকু তাঁকে ডাকেন ‘খোকা’ বলে। সেই প্রিয় কাকুর কথা বলতে গিয়ে এই বয়সেও আবেগে চোখ ছাপিয়ে জল আসে তাঁর। কী অসীম ভালোবাসা থাকলে এমনটা হয়! স্মৃতির সড়ক বেয়ে হাঁটলেন সুপর্ণকান্তি ঘোষ।

প্র চ্ছ দ

ঘুম ভাঙা ইস্তক মান্নাকাকু ফোন রিসিভ করে চলেছেন, টয়লেটে যাবার সময়টুকু নেই। দেশ বিদেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসছে ফোনে নয় এসএমএস মারফত। একসময় কাকু ফোনটা আমার হাতে দিয়ে ফ্রেশ হতে গেলেন, সেই ফোন হাতে নিয়ে আমার হল কেলেঙ্কারির দশা।

শেষ কবে সাক্ষাৎ হয়েছে?

গতবছর কাকুর জন্মদিনে প্লেনে উড়ে গিয়েছিলাম বাঙ্গালোরে। প্রায় আড়াই বছর পর কাকুর সঙ্গে দেখা। এই বয়সেও মান্নাকাকুর উচ্ছ্বাস দেখে সত্যিই প্রশংসা করতে ইচ্ছে করে। কাকুর ফরমায়েস অনুযায়ী কলকাতা থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম ইয়া বড় সাইজের গলদা চিংড়ির মালাইকারি। সঙ্গে কলকাতার বিখ্যাত দোকানের বেশ কিছু মিষ্টি ও আরও অনেক কিছু।

'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা' সৃষ্টির মুহূর্ত। মান্না দে এবং সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ

মান্না দে-র জন্মদিন বলে কথা। কেমন ছিল দিনটা?

সে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। সেরা গায়কের জন্মদিন বলে কথা সে কি আর যেমন তেমন ব্যাপার! সে দিনটার কথা ভুলব না। সকাল থেকে ফোন রিসিভ করতে করতে হয়রানির একশেষ। ঘুম ভাঙা ইস্তক মান্নাকাকু ফোন রিসিভ করে চলেছেন, টয়লেটে যাবার সময়টুকু নেই। দেশ বিদেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা আসছে ফোনে, নয় এসএমএস মারফত। একসময় কাকু ফোনটা আমার হাতে দিয়ে ফ্রেশ হতে গেলেন, সেই ফোন হাতে নিয়ে আমার হল কেলেঙ্কারির দশা। একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতে যাবার সময় করতে পারছিলাম না! এরপর ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করল মানুষ। এল ডাক্তারদের একটা ফুল টিম। মিষ্টি, ফুল নিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন তাঁরা। তারপর এল এক স্কুলের দিদিমণি সহ ছাত্রছাত্রীর দল। এইভাবে বিকেল পর্যন্ত চলল। শেষে এল মেয়ে-জামাই। মনে পড়ে সারাটা দিন সেদিন কাকু তাঁর প্রিয় চেয়ারটাতে একভাবে বসে ছিলেন। ভক্তদের ভালোবাসার অত্যাচারে এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করেননি তিনি। আর সঙ্গে সারাদিন ধরে স্মৃতিচারণা, গানে গানে আড্ডা চলল। শেষে বিরিয়ানি, চিকেন চাপ সহযোগে ডিনার সেরে আমি ফিরে এলাম হোটেলে। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

মান্না দে-র সঙ্গে ব্যক্তিগত নাকি পেশাদারি সম্পর্কে বেশি জড়িত ছিলেন?

দুটোই। তবে বেশি পার্সোন্যাল। বাবাকে পেয়েছি মাত্র সতেরো বছর। আর আজ পঁয়তাল্লিশ বছর মান্নাকাকুর সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক। আমার যে কোনও কিছুতেই কাকু অভিভাবকের মতো আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। মনে আছে বাবার চলে যাবার দিনটা। মান্নাকাকু এসে আমাকে

জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলা যায়, আমার এ জীবন পূর্ণ হয়েছে মান্নাকাকুর কাছেই। আজ বুঝি, আদতে আমি কিছুই হারাইনি। হি ইজ অল-ইন-ওয়ান ফর মি।

সুরকার নচিকেতা ঘোষের ছেলে হিসাবে নিজেকে কতটা ভাগ্যবান মনে করেন?

আমার পরম সৌভাগ্য আমি এক নক্ষত্রের আত্মজ। যাঁর সূত্রে গুণে গরিমায় ভুবনজোড়া আসন পাতা মানুষেরা আমার কাকা-পিসি হয়ে গিয়েছেন জন্মসূত্রেই। আদরে প্রশ্রয়ে একদিনের জন্যও মনে হয়নি যে বাবার সঙ্গে এঁদের পেশাগত সম্পর্ক, আর মনে হওয়ার কোনও কারণও ছিল না। বাবার তখনও তা মাথায় ওঠেনি কাকুর। তারপর থেকে তো বাবার সঙ্গে বহুবার গিয়েছি, থেকেছি মান্নাকাকুর স্বপ্নপুরী 'আনন্দন-এ।' সেখানে আন্টির(মান্নাকাকুর স্ত্রী) হাতের সেই কলাপাতা দিয়ে মুড়ে বাঁধা ভাপা পমফ্রেট। আহা! সেই অনবদ্য স্বাদ আজও স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে এক অসামান্য গানের মতোই।

অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে মান্না দে কোথায় আলাদা আপনার চোখে?

ভারতবর্ষে বহু শিল্পী জন্মেছেন, কিন্তু আমার জীবন পরিধিতে মান্না দে মাপের আর একজনও নেই কোনওদিক থেকেই।

'সে আমার ছোট বোন' সৃষ্টির মুহূর্ত। মান্না দে, সুরকার সুপর্ণকান্তি ঘোষ এবং গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

তৈরি একখানা গানও কি আমি বা আমার দুই বোনের চেয়ে যত্ন কম পেয়েছে! বরং অনেক বেশিই পেয়েছে। তবে অনেক সময় অভিমান হয়েছে সে সময় দাঁড়িয়ে, জীবনের মহার্ঘ এত কিছু হারিয়ে যৌবনকে হারিয়ে ফেলেছি দারিদ্রে অনটনে। কিন্তু এখন বুঝি, সে সময়টা আমার কাছে অনেক দামি ছিল। এক ছিলিম আড্ডা না মেরেও গৌরীকাকাকে (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার) চেপে ধরে আড্ডা নিয়ে এক যুগান্তকারী গানের সুর করে ফেললাম, তা ইতিহাসও হয়ে গেল।

মান্না দে-র সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি?

প্রথম কবে দেখেছি তা মনে নেই। সম্ভবত 'ছোটা সা সওয়াল' নামে একটা হিন্দি ছবির রেকর্ডিংয়ে। সময়টা ষাটের দশকের মাঝামাঝি। বাবা ছিলেন ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক। মান্না দে-র মাথায় যে বিশেষ টুপি দেখে সবাই অভ্যস্ত, শিল্পী হিসেবে তো বটেই, মানুষ হিসেবেও ওঁর জুড়ি নেই। কণ্ঠশিল্পী হিসেবে জীবন্ত কিংবদন্তী এই মানুষটিকে সবসময় তাঁর গানের সুরকারকে বলতে শুনেছি 'নচিবাবু গানটা শিখিয়ে দিন' বা মজা করে 'গানটা আমারে শিখাইয়া দেন'। আবার আমার সুরে পঞ্চাশটিরও বেশি গান গাইবার আগে বলেছেন ' অমুক দিন এসে খোকা গানটা আমাকে শিখিয়ে দাও।'

মান্না দে কে এত ভালো লাগার কোনও বিশেষ কারণ?

আমি তখন পড়াশুনো করি। সঙ্গে চলছে বাজানো। বাবার রিদিম্ অ্যারেঞ্জ করছি। আমি আবার আশৈশব পঞ্চমদার ভক্ত। সেই সূত্রে মাথার মধ্যে পঞ্চমদা সদা জাগ্রত। তখন বাবার কাজ চলছে 'ছুটির ফাঁদে', 'সেই চোখ' ছবিগুলোর। 'মুশকিল আসান' গানটার রিদিম্টা করছি বাবার বকুনি

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় গৌরীকাকা ও শক্তি ঠাকুর এসেছিলেন আমার বাড়িতে। আমি তখন আমার পড়ার ঘরে বসে এম কমের পড়া পড়ছি। গৌরীকাকা আমাকে ডেকে বললেন, 'ও হে ছোকরা, ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছ?' তখন আমি গৌরীকাকাকে বললাম, 'এই আড্ডা নিয়ে তো একটা গানও লিখতে পারেন।'

শুনেও। একদিন ফ্লোরে বাবা কিছুতেই আমার রাত জেগে মাথা খাটিয়ে করা রিদিম্ প্যাটার্নটা মানছেন না। বাবার ওপরে কথা বলার সাহস কারও নেই ফ্লোরে। মান্নাকাকু দূর থেকে ব্যাপারটা বুঝে এগিয়ে এসে বাবাকে বললেন, 'দিন না বাচ্চা ছেলেটাকে ওর কাজটা করতে। ভালোই তো লাগছিল, শুনলাম।' মান্নাকাকুর কথা বাবা ফেলতে পারতেন না। এখানেও আমার জীবনে মান্নাকাকু জড়িয়ে গেলেন। আমার যে কী ভালো লেগেছিল সেদিন।

নচিকেতা ঘোষ ও মান্না দে-র বিশেষ সম্পর্কের কথা কিছু বলুন।

অসাধারণ সম্পর্ক ছিল। মনে আছে 'স্বয়ংসিদ্ধা' ছবির 'কিচিমিচি কিচিমিচি' গানটা কিশোরকুমারকে দিয়ে গাওয়ানোর প্রবল ইচ্ছা প্রযোজকদের, কিন্তু বাবা ঠিক করলেন গানটা মান্নাকাকুই গান। শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে মান্নাকাকুকে দিয়েই রেকর্ড করান বাবা। রেকর্ডিং শেষে কাকু নিজেই তাঁর ফিয়াট চালিয়ে বাবাকে আর আমাকে লাঞ্চ করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন সদ্য সদ্য খোলা মুম্বইয়ের 'কপার্স চিমনি' রেস্তঁরায়।

সুরকার নচিকেতা ঘোষ সম্পর্কে কিছু বলুন।

বাবার থেকে মহার্ঘ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দেরাজভরা তাঁর গানের ঝুলি আর তাঁর মেজাজি কৌলিন্য। আজীবন যা ভাঙিয়ে খাব। চুরি যাওয়ার ভয় নেই, ভয় নেই আয়কর, সিবিআই হানার। বাবার দেরাজ খুলে একদিন পেলাম গুপ্তধনের সন্ধান। বাবার বাতিল করে দেওয়া অজস্র গানের ভাণ্ডার। তাঁর সুরকন্যার রূপ, গুণ আর বংশকৌলিন্যের সঙ্গে সে সব গানের বাণীর মিলন সম্ভব হয়নি।

সুরকার হিসেবে আপনার পথ চলা শুরু কবে থেকে?

আমার প্রথম সুর মান্না দে-র গাওয়া 'সে আমার ছোট বোন' গানটি। এক সাংবাদিক মারফত মান্নাকাকু খবর পেয়েছিলেন আমিও সুর করছি। একদিন ডেকে পাঠালেন তাঁর বাড়িতে। এবং আমার তৈরি গানও শোনাতে বললেন। শুনে তাঁর ভালো লাগল। তারপর আমার হাতে একটা লেখা দিয়ে বললেন, 'শোনো, আরও দু'জনকে একই লেখা দিয়েছি। তাঁরাও সুর করছে একই গানের। খোকা, তোমার সুর আমার ভালো লাগলে তবেই গানটা গাইব, নচেৎ নয়। তুমি তখন মন খারাপ কোরো না। এ বছর আমি নতুন কিছু করতে চাইছি। তাই তোমাকে দিলাম।'

মাসখানেক বাদে মান্নাকাকু কলকাতায় এলেন। এবং আমাকে বললেন গানটা শোনাতে। মান্নাকাকু চুপ করে গানটা শুনলেন। গান শেষ হতে মান্নাকাকুর দু'চোখ ভরে জল। বললেন, 'অপূর্ব সুর করেছ খোকা!' সেই শুরু নিজের পথে হাঁটতে শেখা। তারপর মান্নাকাকু বললেন, 'আমি এবার খোকার সুরেই গাইব।' এরপর আমি ভূপেন হাজারিকার গানেও সুর করেছি।

আপনার সুপার হিট গান 'কফি হাউসের সেই আড্ডা' গানটির কথা কীভাবে মাথায় এল?

গানটার কথা গৌরীকাকার (গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)। মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় গৌরীকাকা ও শক্তি ঠাকুর এসেছিলেন আমার বাড়িতে। আমি তখন আমার পড়ার ঘরে বসে এম কমের পড়া পড়ছি। গৌরীকাকা আমাকে ডেকে বললেন, 'ও হে ছোকরা, ঘরে বসে আড্ডা দিচ্ছ?' তখন আমি গৌরীকাকাকে বললাম, 'এই আড্ডা নিয়ে তো একটা গানও লিখতে পারেন।' সেই ১৯৮৩-তে একরকম গায়ে পড়েই লিখিয়েছিলাম 'ঝফিহাউস' গানটা। মান্নাকাকুকে শোনাতেই তিনি অসম্ভব খুশি। গৌরীকাকাকে নিজেই ফোন করে গানটা গাইতে চান বললেন। তারপর তো ইতিহাস।

সেই সব পুরোনো দিনের কথা ভাবলে, নিশ্চয়ই মন খারাপ করে?

অবশ্যই। মন খারাপ যেমন লাগে, তেমন ভালোও লাগে এই সব স্মৃতির পাতায় চোখ বোলাতে। কত কথাই মনে পড়ে। আমি তখন হাফ প্যান্ট ছেড়ে ফুল প্যান্ট ধরেছি। বাবার গানে ফ্লোরে রিদিম্ বাজাই। মান্নাকাকু আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে আসতেন। কাজকর্মের ফাঁকে যখন বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, আমি ওঁদের কথাগুলো চুপ করে বসে গিলতাম। মুম্বইয়ের নানা গল্প। আজও মনে আছে 'সীতা অউর গীতা' ছবির 'অভি তো হাথ মে জাম হ্যায়' গানটিতে মান্নাকাকু তাঁর মুগ্ধতার কথা বলেছিলেন। শচীন দেববর্মণের সুরে লতাজির গাওয়া 'খায়ি হ্যায় রে হমনে কসম' গানটাও মান্নাকাকুর দারুন ভালো লেগেছিল। লতাজির ভূয়সি প্রশংসা করেছিলেন মান্নাকাকু। ভালো লাগে এই সব রঙিন দিনগুলির কথা ভাবতে।

পাশাপাশি যখন মান্নাকাকুর সঙ্গে কাজ করেছি সে সব দিনের কথাও খুব মনে পড়ে। এমন এক জীবন্ত কিংবদন্তিকে কাছ থেকে দেখার ও শেখার সৌভাগ্য হয়েছে ভেবে নিজেকে সত্যিই ভাগ্যবান বলে মনে হয়। ❖

চিরকালীন মান্না-উত্তম

উত্তমকুমারের লিপে হেমন্তদার জুটির বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান্নাদার দ্বারস্থ হতেন সুরকারেরা। সৃষ্টি হত চিরকালীন কিছু গান।

বী রে শ চ ট্টো পা ধ্যা য়

কথা বলতে বসেছি উত্তমের লিপে মান্না দে-র গাওয়া গান নিয়ে। একজন মহানায়ক। অন্যজন চিরপ্রণম্য, চিরকালের সঙ্গীতশিল্পী। এই দু'জনের যুগলবন্দী জন্ম দিয়েছে বহু হিট, সুপারহিট গানের। সে সব গান শুনে মানুষ পাগল হয়েছে। হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে। সেই সব চিরকালীন গানগুলির দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক।

প্রথমেই মনে পড়ছে যে গানটির কথা, সেটি, 'আমি যে জলসাঘরে বেলোয়াড়ি ঝাড়, নিশি ফুরালে কেহ চায় না আমায়, জানি গো।' ছবির নাম 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি'। উত্তমকুমার-তনুজা অভিনীত সুপারহিট ছবির এই অসামান্য

বলতে ইচ্ছে করছে 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবির কথা। উত্তমকুমার ছিলেন জমিদারের ভূমিকায়। সেখানে ছিল এক আসর মাতানো গান— 'কাহারবা নয়, দাদরা বাজাও, উল্টোপাল্টা মারছ চাঁটি, শশীকান্ত তুমিই দেখছি আসরটাকে করবে মাটি'। এ গানেও উত্তম-মান্না জুটি মাত করে দিয়েছিল। গান ফিরেছিল লোকের মুখে মুখে।

গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ক্লাসিক্যাল টাচের গান। অনবদ্য গেয়েছিলেন মান্নাদা। আর তেমনই যত্ন করে লিপ দিয়েছিলেন উত্তমদা। এ গানের তুলনা হবে না। বলতে পারি এই ছবিরই আরেকটা গানের কথা—'চম্পা চামেলি গোলাপেরই বাগে'। সন্ধ্যা মুখার্জি-মান্না দে-র ডুয়েট। এই গানটাও খুবই পপুলার হয়েছিল।

বলতে ইচ্ছে করছে 'সন্ন্যাসী রাজা' ছবির কথা। উত্তমকুমার ছিলেন জমিদারের ভূমিকায়। সেখানে ছিল এক আসর মাতানো গান— 'কাহারবা নয়, দাদরা বাজাও, উল্টোপাল্টা মারছ চাঁটি, শশীকান্ত তুমিই দেখছি আসরটাকে করবে মাটি'। এ গানেও উত্তম-মান্না জুটি মাত করে দিয়েছিল। গান ফিরেছিল লোকের মুখে মুখে।

কিংবা ধরা যাক, 'বনপলাশির পদাবলী'। রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হয়েছিল ছবিটি। ছিলেন উত্তম—সুপ্রিয়া। এই ছবির একটা গানের কথা মনে পড়ছে। দৃশ্যটিতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমদা আর বাসবী নন্দী। গানটার কথা ছিল 'ও ভাবের নাগরী'। এ গানটিও ভারী সুন্দর।

আরেকটি গান—'মানুষ খুন হলে পড়ে মানুষই তার বিচার করে, নেইকো খুনের মাফ, তবে কেন পায় না বিচার নিহত গোলাপ? বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নিহত গোলাপ?' কী অপূর্ব কথা! এ গানেরও লিপে উত্তমদা, গায়ক মান্নাদা। কোনও দিন ভোলা যাবে এ গান?

ঠিক যেমন ভোলা যাবে না এই গানটিও। ছবির নাম 'জীবন-মৃত্যু'। ১৯৬৭ সালে মুক্তি পাওয়া এ ছবির গান 'কোনও কথা না বলে'। উত্তম-সুপ্রিয়ার দেওয়া লিপ। উত্তম-মান্না জুটির এও এক অসামান্য সৃষ্টি।

কিংবা শংকরের বেস্ট সেলার উপন্যাস 'চৌরঙ্গী'? উপন্যাসটি অবলম্বনে তৈরি হওয়া ছবির সেই বিখ্যাত গানটা মনে করুন। 'বড় একা লাগে এই আঁধারে, মেঘেরও খেলা আকাশপানে'। কী অপূর্ব মায়া স্ক্রিনে ফুটিয়ে তুলেছিলেন উত্তমকুমার। আর তার ঠোঁটে এ গান তুলে দিয়েছিলেন সেই মান্না দে!

ছবি বিশ্বাস ও উত্তম কুমার

এভাবে ক'টা গানের কথা আর বলব? বলে বোধহয় শেষ করা যাবে না। কত কত যে মণিমুক্তো ফলিয়েছে এই জুটি! সত্যিই ভাবা যায় না। এখন কথা হচ্ছে, উত্তমদার দেওয়া

লিপে হেমন্তদার গাওয়া গানগুলিও তো সুপারহিট। হেমন্তদাও তো কম বড় শিল্পী ছিলেন না। বিরাট গায়ক! গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার বলতেন, 'হেমন্তদাকে দিয়ে যদি খবরের কাগজও পাঠ করানো হয়, উনি সেটাকেও গান করে তুলতে পারেন।' তাছাড়া লোকে উত্তমকুমারের লিপে কারও গান শুনলে প্রথমেই ভেবে বসেন গায়কের নাম বোধহয় হেমন্তদা। এমনই এ জুটির জনপ্রিয়তা। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, কেন তবে মান্না দে-কে দিয়েও উত্তমদার ছবির গান গাওয়ানো হত? যেখানে উত্তম-হেমন্ত জুটির রসায়ন অত লোকপ্রিয়! হেমন্তদার সঙ্গে যখন উত্তমদার জুটি জমেই গিয়েছিল, তাহলে কেন সুরকাররা মান্নাদার সঙ্গে উত্তমদার

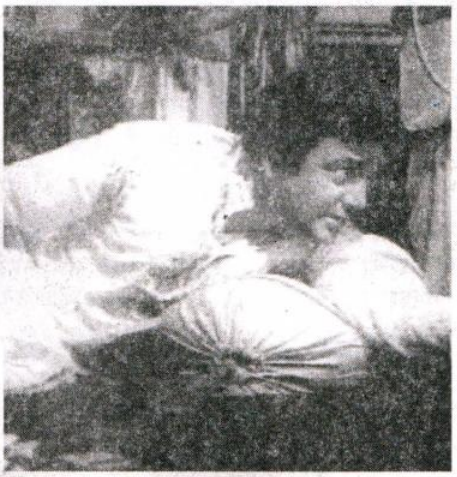

আরেকটা কম্বিনেশন তৈরি করলেন?

এই উত্তরটা খুঁজতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে একটা ছবির কথা। ছবির নাম 'একদিন রাত্রে'। সেই ছবিতে ছবি বিশ্বাসের লিপে মান্নাদা একটা গান গেয়েছিলেন। গানটা হল 'এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সবই হয়, সব সত্যি।' গানটির দৃশ্যে ছবি বিশ্বাসকে দেখা যায় মদ্যপ এক চরিত্রের বেশে। টলতে টলতে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন তিনি। হাঁটতে হাঁটতে গানটি গাইছেন। এখানে গানটি গাইবার সময়ে গায়ককে মাথায় রাখতে হচ্ছে চরিত্রটির মাতাল ভঙ্গির কথা। অর্থাৎ গানটি গাইতে গিয়ে এক ধরনের অভিনয়ও করতে হবে গায়ককে। এটা খুবই শক্ত কাজ। আর তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ত মান্নাদাকে। এভাবেই উত্তমকুমারের লিপে হেমন্তদার জুটির বিরাট সাফল্য সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান্নাদার দ্বারস্থ হতেন সুরকারেরা। সৃষ্টি হত চিরকালীন কিছু গান। আজ সেই সব গানের কথা মনে পড়লে, পুরোনো দিনগুলো যেন আবার ফিরে আসে!

যতদূর মনে পড়ছে এই জুটির প্রথম হিট 'গলি থেকে রাজপথ' ছবিতে 'লাগ লাগ লাগ ভেল্কির খেলা' গানটি। সুর সুধীন দাশগুপ্তের। ওঁর সুরে বেশ কিছু অসাধারণ গান আছে এই জুটির। 'শঙ্খবেলা' ছবির 'কে প্রথম কাছে এসেছি' গানটার কথা এ প্রসঙ্গে বলতে পারি। যেমন গান, তেমন দৃশ্যায়ন! জলের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছেন উত্তমকুমার আর মাধবী মুখার্জি। মাধবীদির গলায় গানটি গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর। আর উত্তমদার গলায় মান্নাদা। রোম্যান্টিক গান হিসেবে এ গানটির আবেদন চির অমলিন। ওই ছবিরই 'আমি আগন্তুক, আমি বার্তা দিলাম' গানটি আবার উত্তমকুমারের অননুকরণীয় স্টাইল স্টেটমেন্ট। মান্নাদার কণ্ঠে উত্তমদার চৌম্বক উপস্থিতিতে এ গানও সুপারহিট। কিংবা বলতে পারি 'ছদ্মবেশী' ছবির 'আমি কোন পথে যে চলি'। অথবা 'বাঁচাও কে আছো, মরেছি যে প্রেম করে'। সত্যিই অসাধারণ! ক'টা গানের কথা আর বলব? বলতে বলতে চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই সোনালী সময়ের কথা। যখন একের পর এক মান্না-উত্তম জুটির গান মুক্তি পাচ্ছে আর মানুষের কাছে বিপুল স্বীকৃতি পাচ্ছে।

মান্নাদা যে কত বড় গায়ক সে কথা আর নতুন করে বলার প্রয়োজন কী? উনি এক ক্ষণজন্মা শিল্পী। বহু বছরে এমন শিল্পী একজনই আসে, যাঁর সুরের মাধুরীতে আজও শ্রোতারা মগ্ন হয়ে আছেন। ওঁর গাওয়া গানগুলি যখন আজও শুনি, তখন বুঝতে পারি এমন গান আর কোনওদিনই হবে না। কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র কাছে সঙ্গীতশিক্ষার হাতেখড়ি। এরপরে তালিম নিয়েছিলেন গোলাম মোস্তাফা খানের কাছে। যে গোলাম সাহেবের হাত থেকে পরবর্তী সময়ে আমরা পেয়েছি সোনু নিগম, হরিহরণের মতো শিল্পীকে। তবে একটা কথা বলার। মান্না দে-র মতো গায়কদের তৈরি করা যায় না। তাঁরা পৃথিবীতে আসেনই প্রতিভার বিচ্ছুরণ নিয়ে। গুরুরা কেবল তাঁদের চলার পথকে আরও মসৃণ করে তোলেন।

মান্নাদাকে নিয়ে এত কথা বললাম বটে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি। যদিও একই অনুষ্ঠানে দু'জনেই উপস্থিত থেকেছি। কিন্তু আলাপ করার সুযোগ হয়নি সেভাবে। দূর থেকেই দেখেছি বাংলা গানের এই অবিস্মরণীয় কিংবদন্তী শিল্পীকে। আর এক মহান শিল্পী রাহুল দেব বর্মনের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। কাছ থেকে দেখেছি তাঁর শিল্প সৃষ্টি। কিন্তু মান্নাদার সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি। যাই হোক, মান্নাদার সুস্থ দীর্ঘায়ু কামনা করি। উনি ভালো থাকুন। ❖

অনুলিখনঃ বিশ্বদীপ দে

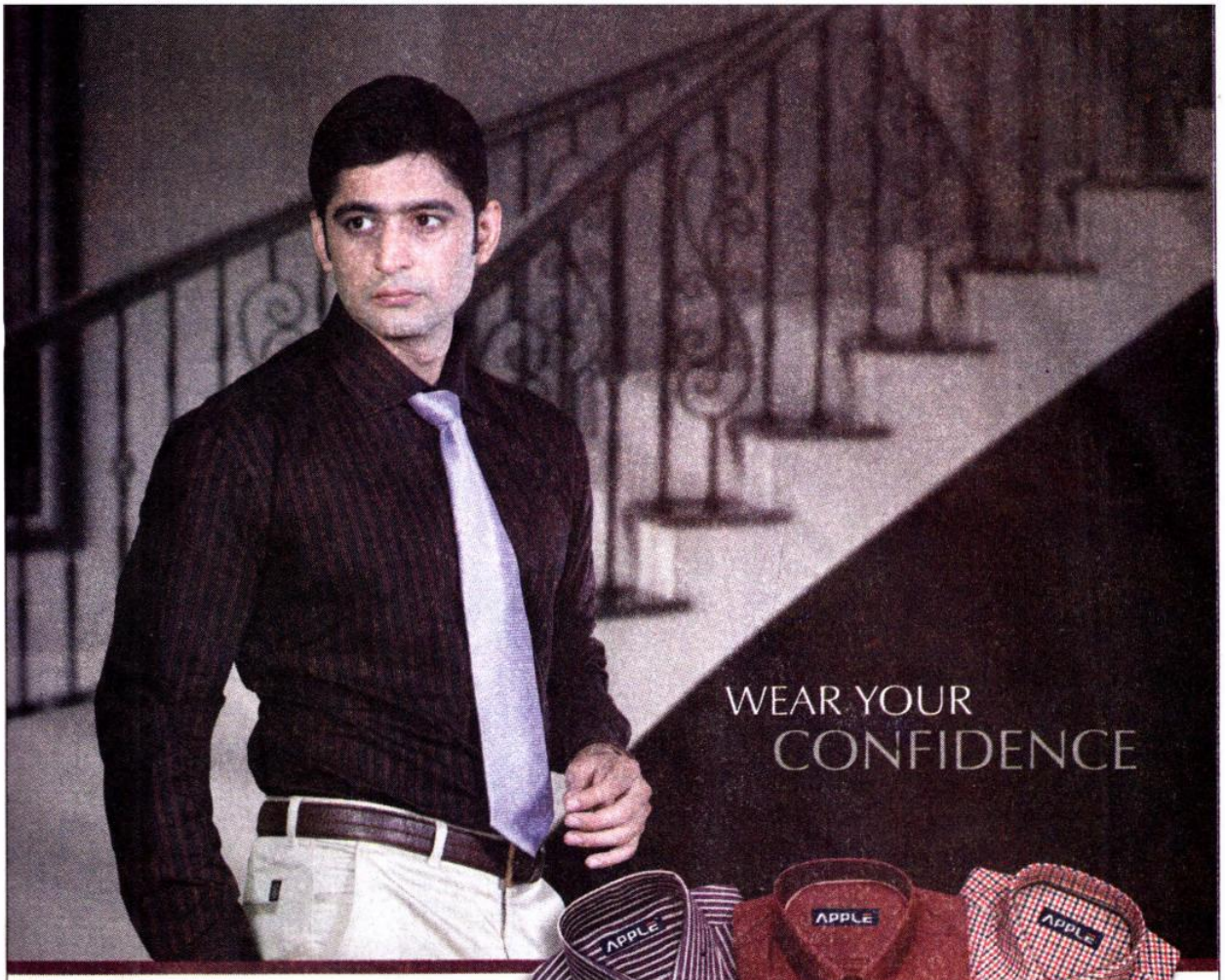

A product of

Rose Valley™
Happiness Unlimited

Rose Valley Fashions Pvt. Ltd.
Godrej Waterside, Tower - 1, 2nd Floor
Office No. 201 & 202, Plot - 5
Block - DP, Sector - V, Kolkata - 700 091
Website: www.rosevalleyindia.com

For trade enquiries, call: +91 91633 24086

APPLE™

Shirts & Trousers for men

megaminds.in

আঁধারের ছেলেপুলে

মৃণালকান্তি সামন্ত

বলগোনা বাজার থেকে পানাগড়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে সন্ধে সাতটার বাস ধরলে হেসে খেলে ঠিক ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে করুণা। দিনের আলো পড়ে আসতে সে তার ডাক্তারি ব্যাগটা রেডি করে রাখছে। এই ব্যাগটা প্রায় নতুনই। বাজারের দীনবন্ধু ব্যাগ সেন্টারে ক্যাটালগ দেখে অর্ডার দিয়েছিল।

বলগোনা বাজার থেকে পানাগড়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে সন্ধে সাতটার বাস ধরলে হেসে খেলে ঠিক ন'টার মধ্যে পৌঁছে যাবে করুণা। দিনের আলো পড়ে আসতে সে তার ডাক্তারি ব্যাগটা রেডি করে রাখছে। এই ব্যাগটা প্রায় নতুনই। বাজারের দীনবন্ধু ব্যাগ সেন্টারে ক্যাটালগ দেখে অর্ডার দিয়েছিল। কলকাতা থেকে আনিয়ে দিয়েছে। আগেরটার থেকে এটা অনেক স্পেসিয়াস। যন্ত্রপাতি এই ব্যাগে ভরতে বেশ সুবিধা হচ্ছে তার। ছোট টর্চের আলোটা একবার জ্বেলে দেখে নিল। হ্যাঁ, ঠিক আছে। শিউলি বলল, কতবার তোমায় বলেছি ছেড়ে দাও ও সব। দশ বছর ধরে কোলে একটা বাচ্চার জন্য ঠাকুরকে কত ডাকি। আর তুমি কি না সেই বাচ্চা নষ্ট করে বেড়াচ্ছ! মাথার উপর ভগবান নেই, না? তিনি ঠিক বিচার করছেন। তোমার ঘরে সোনার চাঁদ কোনও দিন আসবে ভেবেছ?

এই সময়টায় একদম চুপ থাকে করুণা। আজও তার নড়চড় হলো না। অভ্যাসে গা সওয়া হয়ে গেছে কথাগুলো। প্রথম দিকটায় বোঝানোর চেষ্টা করত। তাতে লাভ তো দূরের কথা, উগ্রমূর্তি ধরত শিউলি। ডাক্তার বিনোদ মল্লিক এই এলাকায় গাইনির শেষ কথা। তিনি পর্যন্ত বলে দিলেন, শিউলির বাচ্চা ধারণের ক্ষমতাই নেই।

শিউলি সবটাই জানে। তবু অবুঝের মতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এটা আসলে ওর ভিতরের বঞ্চনা আর নিজের উপর ক্ষোভের নির্যাস। করুণার পেশাটা তাকে বাড়িয়ে তোলে। শিউলির জন্য মায়া হয় করুণার। আর তার নিজের এ বাবদ মনখারাপও কম কিছু নয়। পেশার স্বার্থে সেটুকুকে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে হয়।

করুণার পুরো নাম করুণাসিন্ধু মণ্ডল। ভুল হল একটু।

ডাক্তার করুণাসিন্ধু মণ্ডল। করুণা তেমনটাই দাবি করে। বর্ধমানের বিখ্যাত গাইনি সমীর আইচের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল। তাঁর চেম্বার, নার্সিংহোম দুটোই একবারে দাপিয়ে বেরিয়েছে করুণা একসময়। কাজে হাত পাকাপোক্ত হলে চলে এল সব ছেড়েছুড়ে। বলগোনায় নিজের বাড়ির সামনের ঘরটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে খুলে ফেলল চেম্বার। অবশ্য বেশিরভাগ কাজ তাকে বাইরে গিয়েই করতে হয়।

লোকের কাছে খসানো ডাক্তার হিসেবে পরিচিতি পেলেও নিজেকে করুণা বলে গাইনি প্র্যাকটিসনার। তা বললেও সে কিন্তু গাইনির এক ধরনের কেসই করে। তারও আবার স্পেশালাইজেশন আছে। আইবুড়ো মেয়েদের গোপন পেটই সেই সুপার স্পেশাল কেস। ডাক্তার আইচের মতো করুণা তার এই কাজকে বলে এম টি পি মানে মেডিক্যাল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি। গাঁ গেরামের লোক কি আর অতশত বোঝে? পাপ কাজে পাপ এসেছে শরীরে? চলো করুণা ডাক্তারের কাছে। খসিয়ে এস। বলা যতটা সহজ, কাজটা কিন্তু মোটেই ততটা সহজ নয়। পেট ফোলা থেকে খসা পর্যন্ত কোথাও কোনওভাবে কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেওয়া যাবে না। গন্ধ শোঁকা লোকের থেকে এ গন্ধ লুকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, করুণার পেশেন্ট পার্টি তা হাড়ে হাড়ে বোঝে। তবে হ্যাঁ, পয়সা আছে এ কাজে। বুকের মধ্যে একটু গর্বও উথলায় করুণার, গোটা গোটা পরিবারকে সে লজ্জা অপমানের হাত থেকে বাঁচায়। সেটাই বা কম কীসে? পয়সাকে পয়সাও হল, সঙ্গে আবার সমাজসেবা। জব্বর প্রফেশন করুণার।

নিষিদ্ধ পেট আবার দু'রকম। একটা পেট পয়সাওয়ালাদের। ডাক্তার আইচের চেম্বারে মোটা টাকার কেস সে সব। সে সব হাই ফাই পেট আশাও করে না করুণা। আর একটা পেট পোড়ামুখী গরীবের। আর সেখানেই খোঁজ পড়ে করুণার। চেম্বার ছেড়ে ডাকে চলে যায় দূর দুরান্তে। কাছে পিঠের পার্টি নিয়ে চিন্তা নেই করুণার। তার হাতযশে লোকাল ব্যবসা করুণার একচেটিয়াই বলা যায়। তার লক্ষ্য দূরের কেস। সে সব জায়গায় নাম ছড়ানোর কায়দাটাও তার চমৎকার। দু-পাঁচশো টাকা হাতে ধরিয়ে লোক পাঠিয়ে দিল গুসকরা, কাটোয়া অথবা দুর্গাপুরে। সে লোক সারা রাত জেগে পড়ে রইল স্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে। ভোরবেলা খবরের কাগজের লোক ফিট করল। দরদামে পুষিয়ে নিয়ে রোববারের কাগজে দাও একটা করে করুণার লিফলেট ঢুকিয়ে। ডাক্তার করুণাসিন্ধু মণ্ডলের পাশে অল্টারনেটিভ মেডিসিনের এম.বি.বি.এস (বায়ো)। সঙ্গে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সার্টিফিকেটের লেজুর। ডাক্তার আইচের কাছে থাকতেই বিষয়টা জেনেছিল করুণা। ডাক্তার আইচের চেম্বার ছাড়ার পরপরই সুযোগটা নিয়ে নিল করুণা। ডাক্তার হিসেবে নিজের ওজন বাড়ানো গেল অনেকটা। আবার পাবলিককে কিছুটা ভড়কে দেবার ব্যবস্থাও হল। একদম নীচে বিঃদ্রঃ দিয়ে মোটা করে লেখা, প্রাইভেট কাজ দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ গোপনে করা হয়। অক্ষরগুলো এত মোটা যে করুণার নাম

চোখে পরার পরেই লোকে বিঃদ্রঃ পড়ে ফেলে। স্টেশন ও অন্যান্য ব্যস্ত প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে পোস্টার মেরে তবে ফিরে আসে করুণার লোক।

লিফলেটের মোবাইল নম্বর দেখে ফোন আসে করুণার। পার্টি ডাইরেক্ট ফোন করে। করুণা কথা বলে নেয় কাছাকাছি ওষুধের দোকানের সঙ্গে। সেইমতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেয় পার্টিকে। সময়টা বেশিরভাগই দিতে হয় অনেক রাতের দিকে। ওষুধের দোকান থেকেও কেসের জন্য ফোন আসে। সেখানে অবশ্য পয়সা কিছুটা কম। দোকানদারকে পার্সেন্টেজ বেশি দিতে হয়। তা হোক। ওষুধ-দোকানদারের রেকমেন্ডেড কেসে ঠিকমতো কাজ করতে পারলে, ভবিষ্যৎ কেসপত্রের দরজা খুলে যায়।

দুই

সুজাতা ফার্মেসিতে পরিষ্কার আলাদা দুটো রুম। বড়টা আসল দোকান। ওষুধ ইনজেকশন সব পাওয়া যায় সেখানে। আর ছোটটায় শুধু ডাক্তার। মানে চেম্বার। সামনে সাঁটা বোর্ডে স্পেশালিস্ট ডাক্তারের লম্বা লিস্ট।

রাত তখন দুটো বাজতে মিনিট দশ পনের বাকি। চেম্বারের দরজা হাফ খুলে বসে আছে সুজাতার মালিক বাবুল মিত্র আর করুণা। সুজাতায় করুণা এসেছে বেশ ক'বার। খুব ভালো কাজও করেছে, তাই মিত্র কেস পেলেই করুণাকে খোঁজ করে। তাছাড়া মিত্তির জানে, পাশ করা ডাক্তার না হোক, ছোকরার হাতটা বড় চমৎকার। গরীব পেশেন্টের সঙ্গে পয়সা নিয়ে চশমখোরের মতো দর কষাকষি করে না। দু-একশো কম দিলেও টাকা মাথায় ঠেকিয়ে পকেটে নেয় করুণা। তবে সে জন্য মিত্তিরের এক পয়সাও কাটে না সে। ঠিক হওয়া টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট মিত্তিরকে বুঝিয়ে দেয় ঠিকঠাক। করুণা বিশ্বাস করে, টাকা একটু কম পেলেও ক্ষতি

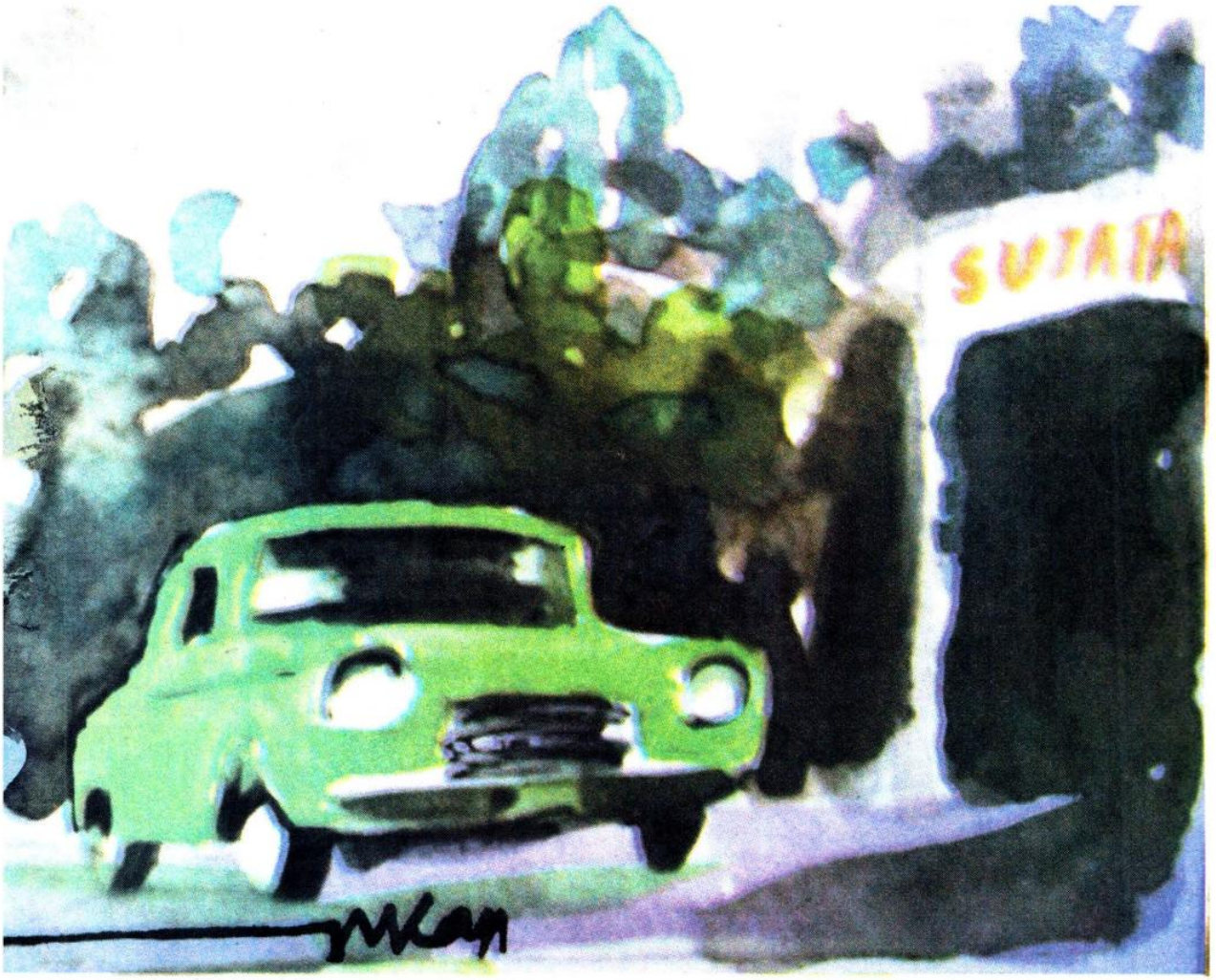

নেই। কেস বাড়লে সব পুষিয়ে যাবে।

সুজাতার ডাক্তার লিস্টে দু-দু'জন ডি.জি.ও., এম ডি গাইনি আছে। তারা কম পয়সায় কাজ করতে চান না। তাছাড়া সে ক্ষেত্রে শুধু ওষুধ বিক্রি করেই যেটুকু ইনকাম। পার্সেন্টেজের কোনও ব্যাপার তো সেখানে নেই। গাঁ-গঞ্জে এখন গরীব মানুষের কেস সংখ্যায় নেহাত মন্দ নয়। গাঁয়ে গাঁয়ে সেই গাঁয়েরই দালাল ফিট করা আছে। ওরাই মিত্তিরকে জোগাড় করে দেয় কেসগুলো। তাদের কিছু কমিশনের ব্যবস্থা আছে। মিত্র জানে, কেসগুলো এভাবে লুফে নিতে না পারলেই মুশকিল। চলে যাবে উদ্ধারনপুরে সাকিল ওঝার কাছে। শেকড় বাকড়ে হাসিল করে ফেলবে কাজ। ব্যবসা করতে এসে মিত্তির কি বসে বসে আঙুল চুষবে?

পরশু রাতে করুণাকে ফোন করেছিল মিত্র। বলল, কেস খুব অ্যাডভান্স। তাড়াতাড়ি না হলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বেশিরভাগ কেস করুণাকে রাতেই করতে হয়। রাতের অন্ধকারের মত গোপনীয়তা আর কে-ই বা দিতে পারে? করুণা খাতা খুলে দেখল, আজ রাতটা তখনও ফাঁকাই ছিল। রাতটা অনায়াসে দিয়ে দিল সুজাতাকে। হিসেব মতো ন'টার মধ্যে পৌঁছে গেছে সে। রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে নিল মিত্তিরের বাড়িতে। খানিকটা বিশ্রাম নিয়েই চলে এসেছে চেম্বারে।

রাজকুসুম থেকে পানাগড় বাজারের দূরত্ব কম নয়। কম করে পাঁচ-ছ'কিলোমিটার তো হবেই। চারের মাইল মোড়ে এসে সিউড়ি রোডে উঠতে হয়। আবার খানিকটা এসে তবে না দার্জিলিং মোড়। জি টি রোডধরে তারপর আরও এক কিলোমিটার হেঁটে আসতে হবে। চারের মাইল মোড়ে আসতে অনেকটা রাস্তায় জঙ্গল পড়ে। রাত দশটা সাড়ে দশটার দিকে ঝমঝম করে বৃষ্টিও হয়েছে। তারপর এতটা রাত হল। মেয়েকে নিয়ে সুজাতায় আসার টাইম দিয়েছে মিত্তির ঠিক রাত দু'টোয়। মেয়ের যা অবস্থা, তাতে রাত, দুর্যোগ অথবা দূরত্ব—এ সব হয়তো কোনও ব্যাপারই হবে

দরজা পুরো বন্ধ করে ঘরে বড় আলো জ্বালিয়ে দিল মিত্তির। মেয়েটার টানা টানা চোখ। গায়ের রঙ কালো। মুখে আলগা শ্রী লেগে রয়েছে। হলুদ কালো ডুরে শাড়িতে বেশ লাগছে। পেটটা বেশ বড় হয়েছে। মিত্তির ঠিকই বলেছিল। একেবারে অ্যাডভান্স কেস। এ সাকশন ফাকশনের কম্মো নয়। প্লেন ম্যানুয়েল ডেলিভারি।

না। রাতের পর রাত বাড়ির ঘুম ছুটে গেছে। সেখানে একটা রাতের এই কষ্টটুকু ওরা করবেই। মিত্তির জানে, ওরা আসবেই। তাছাড়া মিত্তির অ্যাডভান্সও নিয়ে রেখেছে। না এসে যাবে কোথায়?

সুজাতা ফার্মেসির এদিকটা আবার জিটি রোড থেকে একটু ভিতরে। ঘড়ির কাঁটা দু'টোর ঘর পার করে আরও কুড়ি মিনিট এগিয়ে গেছে। চারদিক শুনশান। পুরো বাজার ঘুমিয়ে। পানাগড়ের ব্যস্ত বাজার বলে চেনাই যায় না। মাঝে মাঝে রাস্তার কটা স্ট্রিটলাইট জেগে আছে। ফার্মেসির সামনে আলো বেশ আবছা। সেটাই এখন চায় মিত্তির। চেম্বারে জ্বলছে হলুদ নাইট ল্যাম্প।

ঘোষালের পান দোকানের সামনে লাইচপোস্টের নীচে মূর্তিদুটো নজরে এল ওদের। কালো চাদর জড়ানো দু'জনেরই গায়ে। ফার্মেসি থেকে ওদেরকে ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

চেম্বারের দরজা পুরো খুলে দিল মিত্তির। ওদের বলল, এত দুর্যোগে। ছাতা আনতে পারোনি? সঙ্গে তো টর্চও নেই দেখছি।

মেয়েটার মা বলল, আমাদের চাদরই ঢাকা, চাদরই ছাতা। টচ-ফচ সঙ্গে নিয়েই বা কী হবে! সাপে কাটবে? কাটলে কাটবে। ডাকাতে ধরলে ধরুক। যা বিপদে পড়েছি, আমাদের তো মরাই ভালো।

দরজা পুরো বন্ধ করে ঘরে বড় আলো জ্বালিয়ে দিল মিত্তির। মেয়েটার টানা টানা চোখ। গায়ের রঙ কালো। মুখে আলগা শ্রী লেগে রয়েছে। হলুদ কালো ডুরে শাড়িতে বেশ লাগছে। পেটটা বেশ বড় হয়েছে। মিত্তির ঠিকই বলেছিল। একেবারে অ্যাডভান্স কেস। এ সাকশন ফাকশনের কম্মো নয়। প্লেন ম্যানুয়েল ডেলিভারি। ইমম্যাচিওর ডেলিভারিও। করুণা মেয়েটার মুখে চোখ রাখল। আশ্চর্য! এত সুন্দর মেয়েটাকে বিয়ে করল না ছেলেটা! মিত্তির বলল, ছেলেটাকে তুমি চেনো মাসি?

চিনি মানে! খুব চিনি। তার বে আছে। ঘর সংসার আছে। ওকে নিয়ে ফুত্তি মেরেছে। মেয়ে ভেবেছিল, নিজের সংসার ফেলে ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবে। তারপর ছকু মাহাতো ওকে বিয়ে করে ফিরে নতুন সংসার পাতবে। ছকু তাই বলেছিল ওকে। ও তাতেই বিশ্বাস করেছিল। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে পেট বেড়ে গেল। এখন বলছে, আমার সংসার আছে। ছেলেমেয়ে আছে। তা হারামজাদা, ফুত্তি করার সময় সেটা মনে ছিল না? কেঁদে ফেলল মা।

মেয়ে মুখ নামিয়ে আছে। জল চকচক করছে চোখের কোণে। মেয়ের পেটের শাড়ি সরিয়ে মা দেখালো, কীভাবে সাইকেলের টিউব চেপে বেঁধে রেখেছে পেটতে ঘিরে। টিউব খুলে দিল করুণা। আরও দু'কদম এগিয়ে এল পেট। মা বলল, সব সময় বেঁধে রাখি। তবু লোকে ওর পেট পেট দেখে হাসাহাসি করে। এটা সেটা শুধোয়। বলি, পেটে জল হয়েছে। পানাগড় বাজারের পানু ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে। খচ্চর লোকে শোনে সে সব কথা! চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তা হ্যাঁ পুনির মা, জল হলে আবার ওই রকম পেট হয় নাকি? গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করে হারামজাদা ছতু মাহাতোর। ঘরে বউ থাকতেও আমার লক্ষ্মী মেয়েটাকে নিয়ে ফুত্তি করলি? ভগবান বিচার করবে।

চোখের জল মুছে আবার বলল, লোকের জ্বালায় মেয়ে নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরতেও পারব না। ক'দিন বর্ধমানে থেকে আসব। বলব, বড় ডাক্তারের কাছে জল বের করে নিয়ে এলাম।

করুণাকে কাজ করতে দিয়ে বারান্দায় অপেক্ষায় গেল মিত্তির আর মেয়ের মা। করুণা ডাক্তার আইচের মতো করে মাকে বুঝিয়ে বলে দিয়েছে। অপারেশন তো, রিস্ক একটা

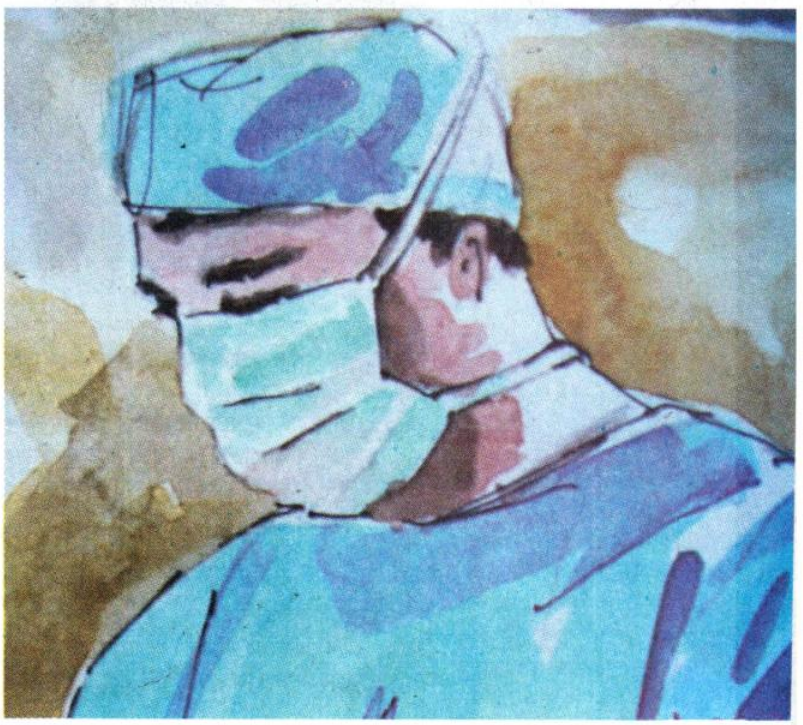

রাস্তার ধারের জমিতে জায়গাও করা আছে। মিত্তির সবটা বলে রেখেছিল। কান্নাটার জোর বাড়ছে। পুনু তার দুর্বল চেহারায় নিজের বুকে গুঁজে দিল ওর মুখ। শিউলির বুকে এমনি করে হামলে দুধ খাওয়া একটা বেবির জন্য আধখানা হয়ে আছে করুণার সংসার। শিউলি কী বলবে? তার কি চেষ্টা নেই?

থাকবেই। লম্বা ফর্ম বের করে টিপছাপও নিয়ে রেখেছে। কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে মা বলল, দুগ্গা দুগ্গা।

চেম্বারের দেওয়াল ঘেঁষে লম্বা টেবিল। তাতে বিছানার চাদর বিছিয়ে সামান্য গদির ব্যবস্থা। তার উপর নীল রেক্সিনের টেবিল কভার। মাথার দিকে একটা পাতলা বালিশ। টেবিলে ওঠার জন্য কাঠের দু'ধাপের ছোট্ট সিঁড়ি। পাশের টুলে বসে আছে মেয়েটা। ম্যালাইন স্ট্যান্ডে ফাইভ পার্সেন্ট ডেক্সট্রোজ ঝুলিয়ে দিল করুণা। মেয়েটা বিছানায় শুয়ে পড়লে আইভি ইনফিউশনের ছুঁচ পিক করল হাতের শিরায়। অন্যান্য ইনজেকশনপত্র সব দিয়ে দিল। এবার মেয়েটার সঙ্গে কথা শুরু করল। ডাক্তার আইচ বলেন, এই সময় পেশেন্টের সঙ্গে ফ্যামিলিয়ার হতে হয়। দু-চারটে কথা বলে তার মনে সাহস আনতে হবে। ওষুধের অ্যাকশন শুরু হবার সময়টাও চলে আসবে কথায় কথায়। করুণা জিজ্ঞেস করল তোমার নাম কী?

একটু সময় থেমে সে বলল, পূর্ণিমা।

— বাঃ, খুব ভালো নাম। বাড়িতে কী বলে ডাকে?

— বাবা বলে পুনু।

— তার মানে তোমার ডাকনাম পুনু। বাবা তোমায় খুব ভালোবাসেন?

— বাসে তো। এখন বাসে না আর।

— এ'রম বলছ কেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা কী করেন?

— জমিজমা যেটুকু আছে, তার চাষবাস করে।

হঠাৎ করুণার হাত জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। বলল, আমি পাপ করেছি। পেটেরটাকে কেন মারবেন তবে? আমাকে শুদ্ধ মেরে দিন না। খুব শান্তি পাই তা'লে।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে করুণা বলল, তুমি কোনও পাপ করনি পুনু। একজনকে বিশ্বাস করে ঠকেছ মাত্র। ও সব বাজে চিন্তা একদম মনে আনবে না।

সার্ভিক্স ডায়ালেট করেছে ভালোই। অ্যামনিওটিক মেমব্রেন জড়ানো হাল্কা পাতলা চুলে মাথা সার্ভিক্স এরিয়ায় দেখা যাচ্ছে। পুনু কষ্টে কাতরাচ্ছে। মুখে আঃ আঃ শব্দ করে চলেছে। করুণা বলল, আর একটু পুনু। এই হয়ে এসেছে।

মাথা এগিয়ে আসছে না আর, গ্লাভস পরে নিল করুণা। ডাক্তার আইচের কায়দায় ঘাড় মাথা ধরে একটু প্রেসার,একটু টান দিতে লাগল করুণা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে এল।

ম্যাচিওরিটির দেরি ছিল সামান্য। ধবধবে ফর্সা রং। কে জানে ছকু মাহাতো ফর্সা কি না। মাথাটা শরীরের তুলনায় বেশ বড়। সরু লিকলিকে হাত-পাগুলো নাড়ছে। খুব আস্তে কান্নার চিঁ চিঁ শব্দ বেরিয়ে আসছে। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর ছেড়ে দিয়েছে পূর্ণিমার। এতদিন ফিটাস নষ্ট করেছে করুণা। আজ একেবারে যেন আস্ত বেবি। সিজার ডেলিভারি করতেন ডাক্তার আইচ। বেবি কট থেকে নার্স পরদিন বেডে দিয়ে বলত, বুকের দুধ বেশি করে দেবেন বেবিকে।

ম্যাচিওরিটি কম থাকলে পেডিয়েট্রিশিয়ান ডাক্তার বাসু হিট চেম্বারের ব্যবস্থা করেন। করুণাকে অবশ্য তেমন কিছুই করতে হবে না। পরের কাজটা তার খুব সোজা। ফিটাস একটু বড় হয়ে গেলে কাজটা তাকে বহুবার করতে হয়েছে। পুনুর মা'র ব্যাগে বড় কোদালটা দেখেছে সে। রাস্তার ধারের জমিতে জায়গাও করা আছে। মিত্তির সবটা বলে রেখেছিল। কান্নাটার জোর বাড়ছে। পুনু তার দুর্বল চেহারায় নিজের বুকে গুঁজে দিল ওর মুখ। শিউলির বুকে এমনি করে হামলে দুধ খাওয়া একটা বেবির জন্য আধখানা হয়ে আছে করুণার সংসার। শিউলি কী বলবে? তার কি চেষ্টা নেই? এই যে ব্যাগ নিয়ে সে এখান ওখান করে— সে কি এমনি এমনি? শুধুই টাকার জন্যে? শিউলিটা যে বুঝল না কিছুতেই। সেই বাড়তি কষ্টটা করুণার একার। করুণা নিজেকে ব্যস্ত রেখে সেটুকু ভুলে থাকতে চায়।

টাওয়েলটা ঝুলছে হ্যাঙ্গারে। ওইটুকু প্রানের আর কত দাম! দু মিনিটের মামলা। শিউলি বলে, তুমি প্রাণ নষ্ট করে বেড়াও। তুমি খুনি।

কিন্তু আইচ ডাক্তারের কথাটাকে পুরো মাত্রায় বিশ্বাস করে করুণা। ক্ষমতাই যেখানে নেই শিউলির। কীই বা করতে পারে করুণা? তার অ্যাবোরশন করে বেড়ানোর সঙ্গেই বা সেসবের কী সম্পর্ক? কিন্তু একটা কথা শিউলি বোধ হয় ভুল বলে না। সে কি সত্যিই খুনী? সামনেরটা তো ফিটাস নয়, বেবি। দশ বছর ধরে শিউলির কোলে ওকেই চেয়েছে করুণা। দরজায় টোকা দিল এবার মিত্তির, হল ডাক্তার? এদের তো আরও কাজ আছে। সব কাজ সেরে আবার ফার্স্ট বাস ধরে বর্ধমান যাবে আত্মীয়বাড়ি। তার আগে ফলো আপ ওষুধপত্র সব দিতে হবে।

ভোরের দেরি নেই আর। বর্ধমান থেকে ফিরে ওরা বলবে, পেটের জল বের করে এনেছে। আঃ শান্তি! লজ্জার হাত থেকে বাঁচবে ওরা। এটাই তো করুণার পেশার তৃপ্তি। হ্যাঙ্গার থেকে এক ঝটকায় টাওয়েল টেনে নেয় খসানো ডাক্তার। ভুল হল। গাইনি প্র্যাকটিশনার করুণা। ❖

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

বানভাসি

সুব্রত সেন

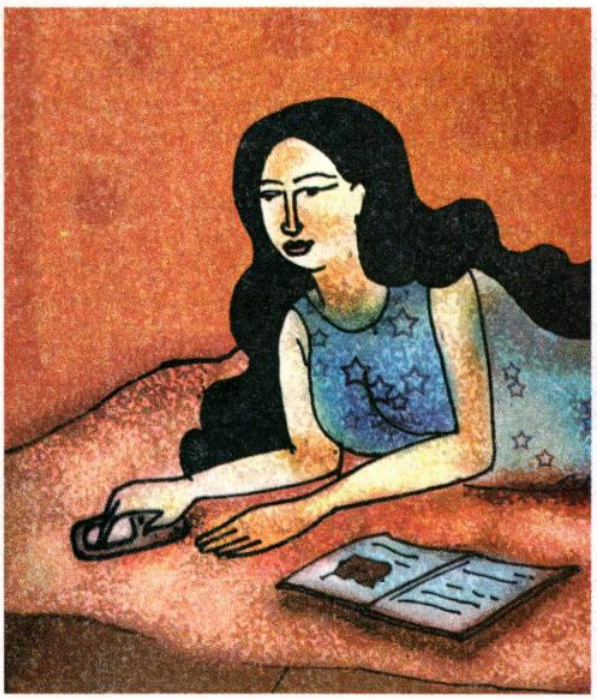

নদী চুপ করে শুয়ে আছে নিজের খাটে। ঘরের অন্য খাটটা ফাঁকা। পুপু এখনও শুতে আসেনি। মা'র সঙ্গে গল্প জুড়েছে বোধহয়।

৩

নদী তাদের গলার আওয়াজ পাচ্ছে, কিন্তু মায়ে-মেয়েতে কী কথা হচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। দু'জনেই কথা বলছে একটু গলা নামিয়ে। গোপন করার মতো করে। কী এত গোপন কথা পুপু মা'র সঙ্গে কথা বলে নদী বুঝতে পারে না। নদী তার গোপন কথা কাউকে বলে না কখনও।

নদীর কৌতূহল হচ্ছে পুপু আর মায়ের গোপন কথা শোনার জন্য। কিন্তু তার সারা শরীর চাদর মুড়ি দেওয়া, তার বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সিলিংয়ে পাখা ঘুরছে বনবন করে, সেই পাখার হাওয়ায় নদীর চুল উড়ছে একটু একটু। তার ঘুম পাচ্ছে। নদী চোখ বন্ধ করল। একটু শীত শীত করছে, পাখাটা বন্ধ করে দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু পাখা বন্ধ করলেই মশারা এসে আক্রমণ করবে।

এই বাড়িতে আসার পরে কালীঘাটের বাড়ির ওই বড় খাটটা ভেঙে দুটো আলাদা সিঙ্গল খাট করে নেওয়া হয়েছে। একটাতে নদী শোয়, অন্যটা পুপুর। দিদি এখন নিজের পয়সায় দোতলায় একটা ঘর বানাচ্ছে। হয়তো কিছুদিন পর থেকে ওই ঘরে ঘুমোবে।

মশার জ্বালায় ঘুম হবে না নদীর। এই বাড়ির এটা একটা মস্ত সমস্যা। কালীঘাটের পাড়ায় মশা ছিল না।

রান্নাঘরে নীলিমা বাসনপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে কথা বলছে পুপুর সঙ্গে। পুপুও তার মায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে রান্নাঘরের কাজে। মার মুখটা খুশি খুশি। মার ধারণা আজকে সন্ধের পাত্রী-দেখা পর্ব বেশ ভাল হয়েছে। নদীকে ছেলেটার পছন্দ হয়েছে। নিশ্চয় ছেলেটা 'হ্যাঁ' করবে নদীকে।

পুপু জিজ্ঞেস করল, 'কী করে বুঝলে দিদিকে পছন্দ হয়েছে?'

'বোঝা যায়। চলে যাওয়ার পরে আবার তোর বাবাকে ফোন করেছিল। ছেলের ফোন নম্বর দিয়েছে। নদীর ফোন নম্বরও নিয়েছে। রাসবিহারীবাবু জিজ্ঞেস করলেন ছেলে যদি ডাইরেক্টলি মেয়েকে ফোন করে আমরা আপত্তি করব কি না।'

'ডাইরেক্ট ফোন করে কী হবে?'

'ছেলে তো আলাদা করে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইতেই পারে। হয়তো আলাদা করে দেখা করতে চায়।'

'দিদি দেখা করবে? দিদির সময় কোথায়? সারাক্ষণ তো অফিস!'

'সে এক-আধদিন অফিস থেকে আগে বেরিয়ে পড়তে পারবে না? এ রকম পাত্র, হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। বিরাট বড়লোক ওরা। বিখ্যাত ফ্যামিলি। এমবিএ ডিগ্রিও আছে। আমেরিকায় থাকত। ইচ্ছে করলেই আমেরিকায় চলে যেতে পারে আবার।'

'আমেরিকায় চাকরি কোথায়? রিসেশনের বাজার মা, ওবামাও ও দেশে চাকরি দিতে পারবে না। কিছুই তো খবর রাখো না তুমি।'

'সে না হয় কলকাতাতেই থাকবে। তা হলে তো আরও ভাল। মেয়েকে দেখতে তো পাব মাঝেমাঝে।'

'একটা কিছু হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হই। এরপর তো আরও একটা মেয়েকে পার করতে হবে।'

'আমরা কি বেড়াল নাকি? একজন একজন করে পার করতে হবে বলছ!'

'বেড়ালই তো তুই। ভিজে বেড়াল। ছোটবেলা থেকেই দস্যিগিরি তোর। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। বড় মেয়েকেই নিয়ে আমার চিন্তা হয়। এত চাপা স্বভাবের।'

পুপু হাসল মনে মনে। কিছু বলল না। তার দিদি চাপা স্বভাবের তো বটেই। তাকেও কিছু বলে না কখনও। কিন্তু পুপু বোঝে দিদির কোনও একটা চক্কর আছে। মাঝে মাঝে সে কারণে দিদি অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চুপিচুপি এসএমএস করে কাকে যেন। অসময়ে দিদির সেলফোনে মেসেজ আসে। সেগুলোতে ভালোবাসার কথা লেখা থাকে। যার থেকে আসে তার নাম জানে না পুপু। দিদির সেলফোন সে লুকিয়ে দেখে নিয়েছে। দিদি তার গোপন প্রেমিকের নাম ফোনে সেভ করে রাখেনি। এক্স বলে সেভ করে রেখেছে। দিদির জীবনের এক্স-ফ্যাক্টর!

এক্স অবশ্য অনেকের জীবনেই থাকে। সেগুলোকে অত গুরুত্ব দিতে নেই। প্রেম করাটা এক ধরনের স্টেটাস, বিয়েটা অন্য ব্যাপার। যার সঙ্গে প্রেম করব তাকেই বিয়ে করব এমন কোনও কথাও নেই। দিদি সিরিয়াস প্রকৃতির, 'এক্স' ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না হয়তো। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারছে না কেন? নিজের লজ্জা করলে দিদি পুপুকে বলতে পারে। পুপু সব ম্যানেজ করে দেবে। প্রেমের ব্যাপারে পুপুও সিরিয়াস।

ঘরে ঢুকে পুপু দেখল নদী নাক অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। ঘুমোলে মানুষের নিঃশ্বাসের রিদম পালটে যায়। খুব জোরে জোরে শ্বাস নেয় মানুষ। নদীর শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও স্বাভাবিক। ঘুমোয়নি বোধহয় এখনও। ঘুমোনোর ঠিক আগের স্টেজে আছে।

নিজের খাটে শুয়ে গায়ের চাদরটা গায়ে টেনে নিল পুপু। আস্তে করে ডাকল, 'দিদি, ঘুমোলি?'

কালীঘাটের বাড়িতে পুপু আর নদী একই খাটে শুত। অন্য ঘরে ঘুমোত বাবা-মা। দিদির সঙ্গে গা জড়াজড়ি করে ঘুমোতে পুপুর ভালো লাগত। এখনও মাঝেমাঝে ইচ্ছে করে দিদিকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়। সেটা সম্ভব নয় আর। এই বাড়িতে আসার পরে কালীঘাটের বাড়ির ওই বড় খাটটা ভেঙে দুটো আলাদা সিঙ্গল খাট করে নেওয়া হয়েছে। একটাতে নদী শোয়, অন্যটা পুপুর। দিদি এখন নিজের পয়সায় দোতলায় একটা ঘর বানাচ্ছে। হয়তো কিছুদিন পর থেকে ওই ঘরে ঘুমোবে। তারপর এক্স বা ওয়াই কাউকে বিয়ে করে অন্য বাড়িতে থাকতে চলে যাবে।

বড় হওয়ার পর মানুষ আলাদা হয়ে যায়। সেটাই নিয়ম। পুপু আর নদীর জীবন একটা সময়ের পর সম্পূর্ণ অন্য খাতে বইবে। নিজেদের বাড়িটাও পালটে যাবে।

মা আর মাসি যেমন। পিঠোপিঠি। দুই বোন। একটা সময়ে নাকি বন্ধুর মতো ছিল, একে অন্যকে না দেখে থাকতে পারত না। এখন মাসির সঙ্গে মার যোগাযোগ টেলিফোনে। কী রে, কেমন আছিস? অনেকদিন তোদের কোনও খবর নেই কেন? এর বেশি কিছু না।

হওয়ার কথাও না। মা'র সঙ্গে মাসির জীবনযাত্রার কোনও মিল নেই। মেসোমশাইরা বড়লোক, কী সব লোহালক্কড়ের ব্যবসা তাদের। মা কেরানিকে বিয়ে করে মধ্যবিত্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে মার কোনও অভিযোগ নেই। যেন এ রকমটা হওয়া স্বাভাবিক। বিয়ে কার সঙ্গে হবে সে সব নাকি ভগবান আগে থেকে ঠিক করে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠান, এর কোনও এদিক ওদিক হওয়ার নেই। দিদির বিয়ে কার সঙ্গে ঠিক আছে? এক্স না আজ সন্ধেবেলা বাড়িতে আসা ঈশান? নাকি সম্পূর্ণ অন্য কেউ? এখনই জানার উপায় নেই কোনও।

'কী রে দিদি, ঘুমোলি?'

চাদরের মধ্যে একটু নড়ে উঠল নদী। ঘুম-জড়ানো গলায় বলল, 'না, বল!'

'লোকটাকে কেমন লাগল বলবি না?'

'কী বলব?'

'কেমন লাগল?'

'কেমন আবার লাগবে! ভালোই তো!'

'তোর পছন্দ হয়েছে তাহলে?'

'আমার পছন্দে কী আসে যায়?'

'আসে যায়। কারণ ছেলেটার মনে হয় তোকে পছন্দ হয়েছে।'

'কী করে বুঝলি?'

'তোর ফোন নম্বর নিয়ে গিয়েছে। আলাদা করে নাকি তোর সঙ্গে বলতে চাইবে।'

'এ আবার কী! ঢং নাকি?'

'আজকাল তো এটাই নিয়ম রে দিদি। সবাই আলাদা করে বসতে চায়!'

'হুঁঃ! বসতে চায়। বসতে পেলে শুতে চাইবে। তারপর শোওয়ার পর বলবে মেয়ে পছন্দ হয়নি।'

'হি হি হি হি। তুই একেবারে যা-তা হয়ে যাচ্ছিস দিদি!'

'হ্যাঁ আমি যা-তা, হল? ঘুমোতে দে তো এখন। বকবক করিস না!'

'বললি না কিন্তু তোর পছন্দ হয়েছে কি না!'

'না হয়নি। ওই রকম ম্যান্দা-মার্কা ছেলে আমার পছন্দ হয় না। দেখতে ভালো অবশ্য।'

'তা হলেই বল! বেশ একটা শাহিদ কাপুরের মতো ছেলে আমার জামাইবাবু হবে, হি হি হি হি...'

'হি হি করে হাসতে হবে না। আমি বিয়ে করব না। ঘুমো তো!'

পুপ একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে। কেন দিদি বারবার বিয়ে না-করার কথা বলে। এক্স-এর জন্য কি? দিদি তা হলে এক্স-কে বিয়ে করছে না কেন? কিন্তু এক্স-এর কথাটা দিদিকে জিজ্ঞেস করা যায় না। দিদি জেনে যাবে পুপু দিদির সেলফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। খুব রাগ করবে তাহলে। দিদি তার থেকে আট বছরের বড়, মনে মনে দিদিকে পুপু ভয় পায়।

চাদরটাকে আরও ভাল করে গায়ে ঢেকে নিয়ে গুটিশুটি মেরে শুল নদী। পুপু বলল, 'তোর বিয়ে না হলে আমারও বিয়ে হবে না!'

'কেন? আমার বিয়ের সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?'

'পাত্রপক্ষ ধরেই নেবে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে বড় মেয়ের। বিয়ে হয়নি তাই। পাগলদের বিয়ে হয় না জানিস তো? ভাববে তুই পাগল তাই বিয়ে হয়নি।'

'আমি পাগল নই পুপু, বাজে কথা বলবি না!'

'পাগলের বংশে কেউ বিয়ে দেয় না। আমারও তখন বিয়ে হবে না। হি হি হি হি...'

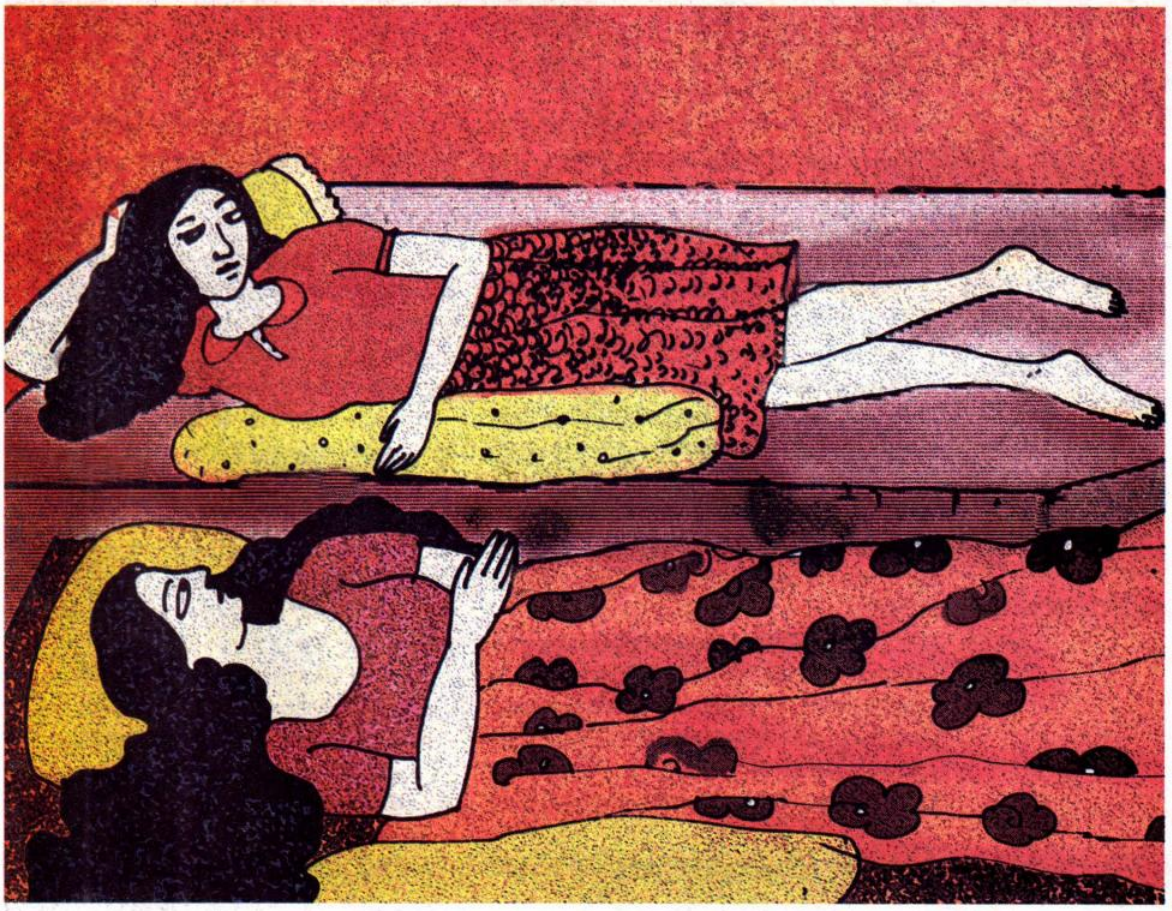

বারিদ চুপ করে গেল। মনে পড়ল মেয়ের বিয়ে নিয়ে নীলিমার সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা তার আগেও হয়েছে। এই নিয়ে চার বার নদীকে দেখতে পাত্রপক্ষ এল। পাত্রপক্ষ আসার পরেই বারিদ এ রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

'উফ্‌ফ। তোর এই হাসিটা থামাবি? বললাম না আমি ঘুমোব?'

'কাল চল্লিশটা টাকা দিবি দিদি?'

'কেন?'

'ব্যালেন্স নেই। রিচার্জ করতে হবে।'

'এই তো সেদিন ভরলি।'

'শেষ হয়ে গেছে। কী করব?'

'সকালে মনে করে নিয়ে নিস।'

পুপু আর কিছু বলল না। দিদির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। নাক অবধি চাদর মুড়ি দিয়ে দিদি শুয়ে আছে। অনেকটা কচ্ছপের মতো দেখাচ্ছে। খোলের আড়ালে সব কিছু লুকিয়ে রেখেছে। দিদির এমনিতেও কচ্ছপের মতো একটা খোল আছে। সব কিছু ওই খোলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। ভিতরে ভিতরে দিদি কী করছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না।

বাড়িটা এখন পুরো নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বাবা-মাও ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। আজ বাবার টেনশন গিয়েছে খুব। একটু টেনশন হলেই বাবা চুপ মেরে যায়। মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। তখন বাবারও চারিদিকে একটা খোল তৈরি হয়ে যায়। আজ যেমন। পাত্রপক্ষ চলে যাওয়ার পরে আজ সন্ধে থেকে বাবা গুম মেরে গিয়েছে। টেনশন হয়েছে বাবার। বাবাও অনেকটা কচ্ছপের মতো।

বাবা-কচ্ছপ। পুপু হাসতে লাগল মনে মনে। বাবা-কচ্ছপ নামটা বাবার সঙ্গে বেশ মানানসই। আগে কখনও তুলনাটা মাথায় আসেনি।

নিজের খাটে ছাদের দিকে মুখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল বারিদবরণ। পাশে শুয়ে রয়েছে নীলিমা। দু'জনের কেউই ঘুমোয়নি। নীলিমা মাঝে মাঝে নড়াচড়া করছে, তার হাতের চুড়ির ঝিনঝিন শব্দ কানে আসছে বারিদের। নীলিমা কথা বলতে চাইছে। চুড়ির আওয়াজে সেই সঙ্কেত।

কালীঘাটের বাড়ির ছাদটা উঁচু ছিল। ছাদের কড়ি-বরগা ছিল। ঘুমোনোর আগে কড়ি-বরগা গুণে সময় কাটানো যেত। এই বাড়ির ছাদটা নিচু। এগারো ফুট। আজকালকার বাড়ির সেটাই নিয়ম। বারিদের ইচ্ছে ছিল বাড়ির ছাদটা উঁচু করার। চোদ্দো ফুট মতো। কড়ি-বরগাও থাকতে পারত। তাতে ছাদের বেশ একটা জৌলুস বাড়ে। রাতে ঘুমোনোর আগে কড়ি-বরগা গুণে সময় কাটানো যায়। কড়ি-বরগা গুনছি এই অজুহাতে চুড়ির সঙ্কেতে সাড়া না দিলেও চলে।

ইচ্ছে থাকলেও কড়ি-বরগা লাগাতে পারেনি বারিদ। এগারো ফুটই রাখতে হয়েছে ছাদের উচ্চতা। আজকালকার রাজমিস্ত্রিরা কড়ি-বরগা লাগাতে জানে না। ছাদ উঁচু করতে গেলে খরচ বেশি হয়। তাই বারিদের চোখের সামনে এখন সাদা ছাদ। সিমেন্ট করে হোয়াইটওয়াশ করা। বৈচিত্র নেই কোনও। ছাদের দিকে তাকিয়ে সময় কাটানোর উপায় নেই। চুড়ির জবাবে বারিদকে সে কারণে কথা বলতেই হবে।

কাজ না হলে মূল্য ফেরত

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ১০০ %আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

মহিলাদের সৌন্দর্য এবং আকর্ষণীয়তার সম্পূর্ণ সমাধান

20 Days

আপনার স্তনকে সুন্দর, সুডৌল, আকর্ষক সুগঠিত করুন

ওষুধের সঙ্গে Breast Improvement যন্ত্র বিনামূল্যে

₹ 630/- 1050/-

সাদা দাগ

আমাদের আবিষ্কৃত নতুন এই ওষুধে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে দাগ বিহীন হতে শুরু করবে এবং খুব শীঘ্রই তা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে।

চিকিৎসায় পূর্ণতালাভের গ্যারান্টি

₹ 630/- & 1260/-

গুপ্তরোগ (লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র বিনামূল্যে)

নতুন আবেগে নতুন আনন্দে

যার সঙ্গে জীবন কাটাবেন তার কাছে ইতস্তত করবেন না

নতুন উদ্যমে আপনার ঘুমন্ত পৌরুষকে জাগিয়ে তুলুন

যে কোনও বয়সে ফলপ্রদ এবং যে কোনও মরশুমে উপযোগী। শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ, সন্তানহীনতা, নপুংশকতা, শুক্রাণুহীনতা, প্রস্রাবের সঙ্গে ঋতু নির্গমন, প্রস্রাবে জ্বালা। এইসব রোগের নিরাময়ের সঙ্গে লিঙ্গকে ৬ ইঞ্চি থেকে ৮ ইঞ্চি লম্বা, দৃঢ়, মোটা বানায়। সহবাসের সময়কে ৩৫ থেকে ৪০ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘতর করে। যে কোনও যৌনরোগের নিরাময় হয়। সঙ্গে কামসূত্র পুস্তিকা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। শীঘ্রই ফোন করুন।

₹ 1050/- & 2100/-

মেদবাহুল্য

পেটের অতিরিক্ত মেদ কমায়, শরীরে জমে ওঠা অতিরিক্ত চর্বিকে সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার দ্বারা নিরাময়ের জন্য যোগাযোগ করুন।

₹ 600/- & 1000/-

পক্ককেশ

চুলপড়া বন্ধ করে

অসময়ে চুল পাকা, চুল পড়াকে বন্ধ করে আমাদের ভেষজ চিকিৎসার দ্বারা আপনার চুলকে কালো, ঘন, দীর্ঘ এবং মসৃণ করে তুলতে শীঘ্রই ফোন করুন।

₹ 630/- & 1050/-

অর্শর চিকিৎসা

আমাদের চিকিৎসায় অর্শ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। যে কোনও রকমের (রক্তাক্ত কিংবা ক্ষতস্থান) সব ধরনের অর্শ নিরাময় সম্ভব। রক্তপড়া থামায় এবং ক্ষতস্থান দ্রুত শুকিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে।

₹ 500/- 1000/-

যেখানেই চিকিৎসাধীন থাকুন না কেন, একবার আমাদের ফোন করুন।

Helpline- Contact : 8 A.M. to 9 P.M

09661689894 / 09905950792

বারিদ বলল, 'ছেলেটা তো ভালোই মনে হল। যদি রাজি হয়, তাহলে আর দেরি করব না কিন্তু। অঘ্রান মাসে-একটা তারিখ দেখে... বুঝলে কি না?'

নীলিমা কিছু বলল না। তার হাতের চুড়ির শব্দ হল আবার। এবার আস্তে, টিং করে। এই আওয়াজের অর্থ হল নীলিমা মনে মনে কিছু ভাবছে।

বারিদ একটু অপেক্ষা করল। তারপর নিজের থেকেই বলল, 'কী হল, কিছু বলছ না যে?'

নীলিমা বলল, 'তোমার তো সব সময়ে গোঁফে তেল দেওয়ার স্বভাব। ছেলে আলাদা করে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে মানেই কি বিয়ে করতে চেয়েছে?'

'দেখা করতে চেয়েছে মানে প্রথম আলাপে মেয়েকে পছন্দ হয়েছে। ওইটাই তো আসল। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট বলে একটা কথা আছে কি না! আর প্রথম আলাপে পছন্দ হয়েছে মানে এর পরে আরও বেশি করে হবে। মেয়ে কি আমার ফ্যালনা নাকি? পাত্র যদি এম বি এ হয়, আমার মেয়েরও কোয়ালিফিকেশন কম নয়, হুঁ!'

'মেয়ে ফ্যালনা নয় বলেই তো চিন্তা বেশি।'

'কেন, চিন্তা কীসের?'

'মেয়ের যদি পাত্র পছন্দ না হয় তখন কী হবে? এমনিই তো মতি-গতি ঠিক বুঝি না।'

'নিজের মেয়ের মতি-গতি বোঝো না, এ আবার কেমন কথা?'

'আজকালকার যুগে বোঝা যায় না সব কিছু। কত কী-ই তো হয় শুনি। তুমি বোঝো নিজের মেয়েদের? আমাকে বলছ কেন?'

বারিদ একটু চুপ করে রইল। নীলিমার কথাটা ঠিক। পুপু বা নদী কী খেতে ভালবাসে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলতে পারবে না। নদীর কোন রংটা পছন্দ তাও সে জানে না। বাবা হয়ে এটা তো মোটেই ঠিক কথা নয়। কাল থেকে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ম করে একটু গল্প-গুজব করা দরকার।

বারিদ বলল, 'নদী না করে দিতে পারে বলে মনে হয়?'

'করতেই পারে, বিশ্বাস কী?'

'ওর কি কেউ আছে টাছে নাকি? তোমায় কিছু বলেছে?'

'না বলেনি। ও কোনওদিন মুখ ফুটে কিছু বলবে নাকি? পেটে বোমা মারলেও নিজের ব্যাপারে কোনও কথা বলতে চায় না।'

'হুঁ। কিন্তু বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে কিন্তু, আমি নিজেই তো অবাক। ছেলেটাকে রীতিমতো ইম্প্রেস করে দিয়েছে!'

'তাই তো দেখলাম। বলে কি না বাড়িতে ফ্রিজ নেই, সব মিষ্টি খেতে হবে কিন্তু। ভয়ে ভয়ে ছেলেটা খেয়েও নিল।'

'হা হা হা। ছেলেটা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। বরাবর বাংলার বাইরে বাইরে মানুষ, মিষ্টি দেখলে নাকি ছাড়তে পারে না। পরে আমাকে বলেছে সে কথা।'

'তা হবে।'

'ও আমাদের জামাই হলে বাড়িতে এলেই মিষ্টি খেতে দেবে। আগে থেকে বলে রাখলাম।'

'বিয়ে হোক আগে।'

'আর মেয়ের বিয়ে খুব ধুমধাম করে দেব। বাড়িতে ভিয়েন বসাব? না ক্যাটারিং? কোনটা ঠিক হবে বল তো?'

'ভিয়েন আজকের যুগে অচল। আগেও তো বলেছি।'

'তা বলেছ।'

বারিদ চুপ করে গেল। মনে পড়ল মেয়ের বিয়ে নিয়ে নীলিমার সঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা তার আগেও হয়েছে। এই নিয়ে চার বার নদীকে দেখতে পাত্রপক্ষ এল। পাত্রপক্ষ আসার পরেই বারিদ এ রকম উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাতের বেলা মেয়ের বিয়েতে কী কী করা উচিত তা নিয়ে নীলিমার সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করতে দেয়।

নীলিমা বলল, 'ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দেবে যে বলছ, আজকাল মেয়ের বিয়ে দিতে কত খরচ হয় সে সম্পর্কে আইডিয়া আছে তোমার?'

'ও কিছু না কিছু ব্যবস্থা হবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা সবটা তো খরচ করিনি। কিছু তো ব্যাঙ্কে জমা আছে।'

'সেই টাকা ফুরিয়ে ফেললে তারপর চলবে কী করে? পুপুরও তো বিয়ে দিতে হবে।'

'কিছু একটা ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব। জলে তো আর পড়ে নেই, মাথার ওপর আস্ত একটা ছাদ আছে, ভুলে যেও না সেটা। সে রকম হলে রাসবিহারীর থেকে ধার করব কিছু, পেনশনের টাকা থেকে আস্তে আস্তে ফেরত দিলেই হবে।'

নীলিমা আর কথা বাড়াল না। বারিদের সঙ্গে কথা বাড়ানোর কোনও মানে হয় না। যে কোনও ব্যাপারে তার অসীম উৎসাহ, হাতে একটু টাকা থাকলে সেই টাকা যতক্ষণ না খরচ হচ্ছে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। অফিসে চাকরি করার সময়েও মেয়ের স্কুলের মাইনের টাকা দিয়ে দেড় কিলোর ইলিশ কিনে বাড়ি ফিরে বলত, 'দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, বুঝলে? না খেলে আর বেঁচে থাকার আনন্দ কী, বলো?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলিমা পাশ ফিরে শুল। বারিদ তো কোনও খবর রাখে না, এত বছর ধরে সংসার কীভাবে চলেছে তা নীলিমাই একমাত্র জানে।

নদীকে বলতে হবে বাবার সঙ্গে কথা বলতে। বিয়েতে অকারণে যেন বেশি খরচ না হয়। নদী বুঝবে নীলিমার সমস্যা। বাবাকে বোঝাতে একমাত্র ও-ই পারবে। নদী খুব বুঝদার মেয়ে। ❖ (ক্রমশ)

অলঙ্করণ : দেবযানী

বসন্ত উৎসব

ঋতব্রত ভট্টাচার্য

বসন্তের সন্ধে নামতেই শান্তিনিকেতন জুড়ে এক সুন্দর সুশীতল বাতাস বইতে শুরু করে। কেউ কেউ বলে এ বাতাসে নেশা ছড়িয়ে আছে। ভালো লাগার অদ্ভুত এক ইচ্ছে এ হাওয়ায় পাল তোলে।

দশ সেই নৌকোয় যুগে যুগে কত পুরুষ-নারী পথ হারিয়েছে। সাবধানীরা বলেন, শেষ বসন্তের এমন বাতাসের সান্ধ্য সংস্করণ নাকি বড় সর্বনেশে। এবারের দোলও বসন্তের শেষ প্রান্তে। এত নর-নারী, এত সব জায়গা থেকে ছুটে এসেছেন এবারের বসন্ত উৎসবে। কী জানি কী হয়? নিন্দুকেরা অবশ্য বলবেন যত সব লেখকের আদিখ্যেতা। প্রতি বছরই তো লাফিয়ে লাফিয়ে ভিড় বাড়ছে। প্রতিবারই তো এমন হয়। আবার আলাদা আর কী হবে! তবু ঘ

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুভশ্রী বুঝল যা পড়ছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ মনে হল বাইরে একবার গেলে মন্দ হত না। যে জিনিস এখনই না কিনলে কোনও ক্ষতি হত না সেই নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর লিপ বাম কিনতে বেরোবে বলে হঠাৎ-ই সে ঠিক করে নিল।

তো কালেভদ্রেই ঘটে। আজ সন্ধের শেষ বসন্তের হাওয়ায় যেন কেমন একটা গা শিরশিরে ভাব।

এমন বাতাস গায়ে মেখে রতন পল্লীর মধুবনে বসে আছে ঋতৃণ। মধুবন এমন এক রেস্তোরাঁ যেখানে মানুষ যত খাবারের অর্ডার দেয় তার থেকে আড্ডা দেয় বেশি। সন্ধে যত গড়াচ্ছে ততই বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা এখানে ভিড় জমাচ্ছে। বাইরে ঘুরতে আসা মানুষও কম নেই। আড্ডা ক্রমশ জমে উঠছে। মেয়েরা শাড়ি পরে সেজে এমনভাবে বেরিয়েছে যে কেউ বলতে পারবে না সে সাজে বাহুল্য আছে। তবে সে সাজে বাঁধুনি আছে— আছে শান্তিনিকেতনী স্টাইল। ফাস্টফুডের হাজারো মানুষের বিচিত্র সব পারফিউমের মিশ্রিত গন্ধে গোটা এলাকা যেন ম ম করছে। এমন জনঅরণ্যে বসে ঋতৃণ চায়ে চুমুক দিচ্ছে। টেলিভিশনের পর্দার কল্যাণে বেশ কিছু মানুষ তাকে চিনতে পারছে। আড়ালে আবডালে ভিড় থেকে মানুষ তাদের চেনাশোনাদের চিনিয়ে দিচ্ছে, 'ওই দ্যাখ টিভির ঋতৃণ ভট্টাচার্য।' ঋতৃণ বুঝতেও পারছে। ভিড়ের মধ্যে নিজেকে কেউকেটা ভাবতে কার না ভালো লাগে! ঋতৃণেরও দিব্য লাগছে। মাঝে মাঝে অস্বস্তিও হচ্ছে। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে মাঝেমাঝে। মধুবন পেরিয়ে সোজা দু'পা এগিয়ে ডানদিকে বেঁকলেই 'কলকাকলি'। মেয়েদের হোস্টেল। সেখানে শুভশ্রী ওর ঘরে বসে জার্নালিজমের বইয়ে মুখ ডুবিয়ে পড়ার চেষ্টা করছে। বিবিসির একটা কেস স্টাডি। বিবিসি-র প্রথমদিককার বেশির ভাগ ক্যামেরাম্যানেরই বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। সামরিক বাহিনীর লোকেরাই সে সময় ক্যামেরাম্যান হিসেবে টেলিভিশনে কাজ করতে এসেছিলেন। পড়তে পড়তে শুভশ্রীর মনে হল ঋতৃণের কথা। কেন কে জানে! আসলে কখন, কোথায়, কার কথা মনে পড়বে তার কি আর কোনও ব্যাকরণ থকে? হয়তো শুভশ্রী ঋতৃণকে জঙ্গলমহলে মাওবাদী আর আধা সামরিকবাহিনীর রণক্ষেত্রে দেখেছে টিভির পর্দায়। হয়তো বা ঋতৃণ এক বিশেষ ধরনের কাঁধে স্ট্র্যাপ দেওয়া সামরিক শার্ট পরে বলে... সত্যি ঋতৃণের মোবাইল নম্বরটা নেওয়া হল না। ভাবনাটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল শুভশ্রীর। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুভশ্রী বুঝল যা পড়ছে কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ মনে হল বাইরে একবার গেলে মন্দ হত না। যে জিনিস এখনই না কিনলে কোনও ক্ষতি হত না সেই নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর লিপ বাম কিনতে বেরোবে বলে হঠাৎ-ই সে ঠিক করে নিল। রাত্রি সাড়ে-আটটার মধ্যে হোস্টেলে ঢুকে পড়ার নিয়ম। হাতে আর বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট আছে। যথেষ্ট সময়। শুভশ্রী ভাবল—'যাই, ছুটে যাব আর আসব।' আসলে আমাদের মন সত্যিই বিচিত্র। নিজের ইচ্ছেকে কত অজুহাতে, কত জবাবদিহিতে মনের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে হয়। মনকে বুঝিয়ে, কিছুটা ভদ্রস্থ একটা সালোয়ার কামিজ চাপিয়ে কোনও রকমে চুলটাকে বাগে এনে হোস্টেল থেকে বেরোল সে। বসন্ত-বাতাসে শরীরটা এক লহমায় জুড়িয়ে গেল তার। মুহূর্তে নিজেকে কতটা হালকা মনে হল। সে ভাবল ভাগ্যিস ঘর ছেড়ে সে বেরিয়েছে—তা না হলে এমন হাওয়া খাওয়াটা মিস হয়ে যেত।

হোস্টেল থেকে কিছুটা বেরিয়ে শুভশ্রী বুঝল বসন্ত উৎসবের ভিড়টা রতনপল্লী পর্যন্ত এসে গিয়েছে। মধুবনের পাশ কাটাতে গিয়েই চোখাচুখি হয়ে গেল ঋতৃণের সঙ্গে। ভিড়ে মধ্যে ঋতৃণও তাকে দেখতে পেয়েছে। ওকে দেখেই ঋতৃণ চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর কাছে চলে এল। ভাবগতিক দেখে মনে হবে যেন ঋতৃণ শুভশ্রীর জন্যই বসেছিল। শুভশ্রী একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল—আরে, আপনি এখানে?

—হ্যাঁ। আজ সন্ধেতে কোনও লাইভ নেই। তাই ভাবলাম মধুবনে একটু চা খাই। আসুন না, আপনিও এক কাপ চা খেয়ে যান।

—না থাক।

—থাকবে কেন? এক কাপ চা হয়ে যাক। সেই সুযোগে আমারও আরেক কাপ চা হয়ে যাবে।

শুভশ্রী আর 'না' করতে পারল না। দু'জনে মুখোমুখি বসল। চা-ও চলে এল।

—আপনাদের হোস্টেলটাও তো রতনপল্লীতে, না?

—হ্যাঁ। হাঁটাপথে এক্কেবারে এক মিনিটেরও কম।

—কী আশ্চর্য! আপনাদের হোস্টেলের পাশেই বসে আছি, একবারও ভাবিনি আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

শুভশ্রী বলল, সেটা তো স্বাভাবিক। নিউজের খাতিরে রোজই কত জায়গায় কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। আপনারা কি কারও কথা আলাদা করে মনে রাখেন?

—রাখি না কে বলল আপনাকে? জানেন, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় জীবনটাই একটা আশ্চর্য ভ্রমণ কাহিনি। কত মানুষ, কত ঘটনা।

ঋতৃণের কথাটা শুনে সত্যি বড় ভালো লাগল শুভশ্রীর। মনে হল, একটা পোড় খাওয়া রিপোর্টার হলেও সে বড় সংবেদনশীল। ঋতৃণ সাময়িক বিরতি নিয়ে আবার বলতে শুরু করল।

—জানেন একবার নন্দীগ্রামে এক বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখেছিলাম। গোটা গ্রাম জনশূন্য। বুড়ো প্যারালাইটিক। বেচারা হাঁটতে পারে না। বুড়ি আর কী করবে? বুড়োকে ফেলে তো আর পালাতে পারেন না। তাই ভয়ে নিজেদের বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে লুকিয়ে ছিলেন বাড়ির ভিতর। আমি আর আমার ক্যামেরাম্যান যখন সেই জনশূন্য গ্রামে গিয়ে পৌঁছোলাম তখন দুপুর। আমরা গিয়ে বসলাম ওই মাটির বাড়ির বারান্দায়। বাঁশের কঞ্চির দরজায় ঝুলছে তালা। বসে বসে সিগারেট টানছি। হঠাৎ-ই শুনি ঘরের ভিতরে খুট করে আওয়াজ। আমরা ভাবলাম সাপ-টাপ নাকি! আমার ক্যামেরাম্যান উঁকি মেরে আবিষ্কার করল বৃদ্ধ দম্পতিকে। জানেন, তখন তাদের খাবারের ভাঁড়ার শেষ। ইঁদুরের মাংসও খেতে হয়েছিল তাদের। আমরাই তো ওদের বাজার করে দিয়ে এসেছিলাম। আজও সেই গোলকপতিবাবু আর অতসী মাসিমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে...

তন্ময় হয়ে শুভশ্রী শুনছিল ঋতৃণের কথা। চারিদিকের এত মানুষ, এত কোলাহলের মধ্যেও তারা যেন এক অন্য জগতে। ঋতৃণকে কত প্রশ্ন সাংবাদিকতার তুখোড় ছাত্রী শুভশ্রীর। যেন কিছুই বিনা প্রশ্নে, যাচাই না করে সে মানবে না। ঋতৃণ মন

উজার করে বলে চলেছে। একের পর এক তার অভিজ্ঞতা। কখনও নন্দীগ্রাম। তো কখনও ২০০৬-এ জার্মানির ফুটবল বিশ্বকাপ। কখনও কলকাতার কোনও ঘটনা। তো কখনও কালাহান্ডি। শুভশ্রীর মনে হচ্ছিল রিপোর্টারদের জীবনটা তো সত্যিই একটা আশ্চর্য ভ্রমণ কাহিনি। ঠিকই বলেছিল ঋতৃণ...

—আপনি ঠিকই বলেছেন। কত মানুষ, কত ঘটনার মধ্যে একজন রিপোর্টারকে চলতে হয়, না?

—রিপোর্টার তো তাই। অথচ দেখুন সে কোনও রাজনৈতিক দল, কোনও জাত, কোনও বিশেষ সংগঠনের প্রতি ঝুঁকে গেলেই সর্বনাশ। রিপোর্টার তো আর কারও সাপোর্টার হতে পারে না। কিন্তু সত্যিই কি নিরপেক্ষ হওয়া যায়?

এই প্রশ্ন শুনে ঋতৃণ যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল। চিন্তিত মুখে বলল, 'নিরপেক্ষ বড় কঠিন শব্দ। জানেন তো কথায় বলে পাঁচ হাজার শকুন মরলে নাকি একজন জাত রিপোর্টার জন্মায়!'

—ও সব জানি না। কিন্তু মাঝেমধ্যে আমার কেমন জানি মনে হয় রিপোর্টাররা বড় জটিল।

ক্রমশ আলোচনা গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠছে। হঠাৎ-ই ঋতৃণ কথাবার্তাটায় গিয়ার কষল। পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য একটু হেসে বলল, মেয়েদের চোখের ভাষার থেকে কম জটিল।

বাঁকা চাউনিতে শুভশ্রী জিজ্ঞস করল—কেন মেয়েদের চোখের ভাষা আপনি পড়তে পারেন না?

—অমন দুর্বোধ্য ভাষার পাঠোদ্ধার কি আমার মতন সাধারণ মানব সন্তানের দ্বারা সম্ভব! মেয়েদের চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় প্রাচীন হিব্রুতে কী জানি সব লেখা।

—আমার চোখের ভাষা কিন্তু অনেক সহজ সরল। ধরুন মৈথিলিতে লেখা... বলেই হেসে উঠল শুভশ্রী। বোঝেন মৈথিলি? কেমন জানি থতমত খেয়ে ঋতৃণ বলল, আপনার সান্নিধ্যে কিছু দিন থাকলে ভাষাটায় হয়তো সড়গড় হয়ে যাব।

—বাব্বাঃ, এত আত্মবিশ্বাস!

—না, আপনার ওপর কনফিডেন্স। মনে হয় আপনি শিখিয়ে নেবেন।

বলতে বলতে ঋতৃণ টেবিলের ওপরে রাখা ওর কালো চামড়ার অর্গানাইজারে একটা চাপড় মারল। এই অর্গানাইজারটা ওর নোটস নেওয়ার জায়গা থেকে ডায়রি—সব কাজেই লাগে। ঋতৃণের সর্বক্ষণের সঙ্গী।

চারিদিকে সব মহিলারা সেজেগুজে। কিন্তু শুভশ্রী এক্কেবারেই স্বাভাবিকভাবে বসে। তবু ভিড়ের মধ্যে ওকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। হয়তো একেই বলে ন্যাচারাল বিউটি। দেখতে দেখতে চোখের পলকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। এবার শুভশ্রীকে হোস্টেলে ফিরতে হবে। হোস্টেল ইনচার্জের সে যতই প্রিয় পাত্রী হোক না কেন, এ সব ব্যাপারে সুনেত্রাদি কাউকে রেয়াত করে না। মোবাইলে সময়টা চোখে পড়তেই চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল।

—আমাকে এখনই হোস্টেলে ফিরতে হবে। শুভশ্রী একবার ভাবল মোবাইল নম্বরটা চাইবে। পরক্ষণেই মনে হল, নাহ্। ঋতৃণ যখন একবারও তার মোবাইল নম্বরটা চায়নি তখন আগ বাড়িয়ে তার চাওয়ার কি দরকার? এই হল শুভশ্রী। ছোটবেলা থেকেই সে এমনই। বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

এদিকে টলমল পায়ে হোটেলে ফিরেছে অনর্ঘ্য। তৃণার কথা ওর মাথায় খলি ঘুরপাক খাচ্ছে। একে মদের নেশা, অন্যদিকে তৃণার অবজ্ঞা—এই দুইয়ের ঠেলায় অনর্ঘ্য একেবারে ঘেঁটে

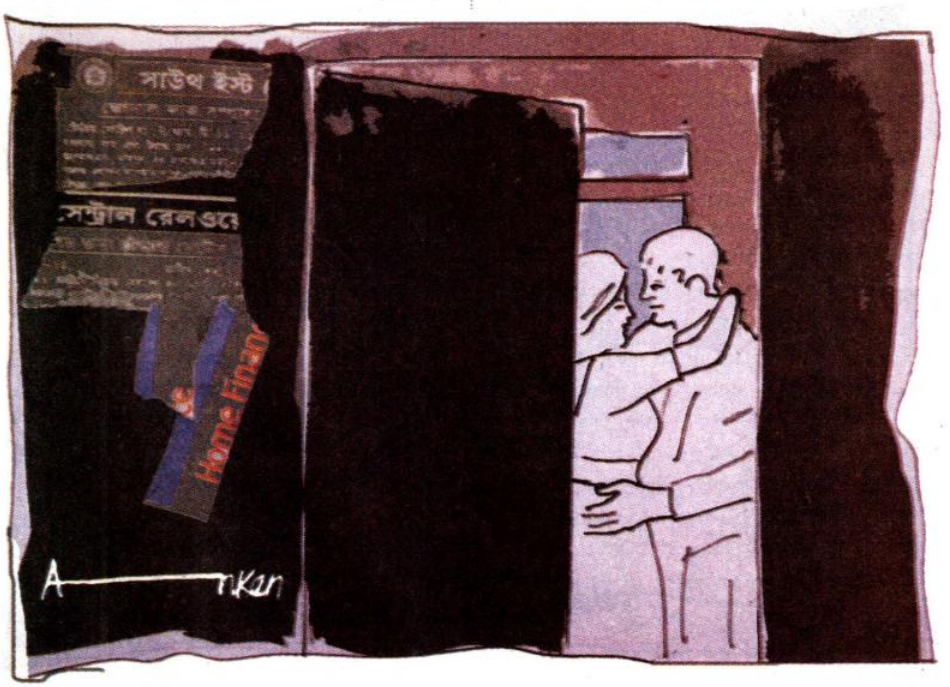

চারিদিকে সব মহিলারা সেজেগুজে। কিন্তু শুভশ্রী এক্কেবারেই স্বাভাবিকভাবে বসে। তবু ভিড়ের মধ্যে ওকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। হয়তো একেই বলে ন্যাচারাল বিউটি।

তৃণার ঘরে ঢুকে কখন সে মোবাইল বন্ধ করে ফেলেছিল আর তো খোলা হয়নি। কোনও রকমে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে সুইচ অন করল সে। মোবাইল অন করতেই একটা এস এম এস এল ওর মোবাইলে।

আছে। মানুষ নেশা করলে তার মধ্যে নানান সত্তা বিচিত্রভাবে বিকশিত হয়। কেউ কেউ নাকি উদার অকপট হয়ে পড়ে, কেউ বা একটু বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ আবার বড্ড বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কারও কারও আবার মাথায় কোনও চিন্তা ঢুকলে তা বেরোতে চায় না। অনর্ঘ্যর হল ঠিক তাই। সে ভেবেই কুলকিনারা পাচ্ছে না কেন আজ সে তৃণাকে... তাহলে কি তারই নিজের শারীরিক অক্ষমতা... হঠাৎই এক ভীষণ ভাবনায় অনর্ঘ্য আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

হোটেলের রুমের বেল বাজাবার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে দিল দেবযানী। রাতের পোশাকে আলুথালু বেশে দেবযানীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। দরজা খুলে আবার চাদর টেনে সে শুয়ে পড়ল। কোনও কথা না বলে ধপাস করে খাটে শরীরটা এলিয়ে দিল অনর্ঘ্য। গোটা ঘরে দুটো মানুষ। কেউ কিছু কথা বলছে না। শুধু শোনা যাচ্ছে এসির শব্দ। এ ঘরে বসন্তের বাতাস ঢোকেনি। কৃত্রিম শীতলতা গোটা ঘর জুড়ে। কিছুক্ষণ বাদে দেবযানী অনর্ঘ্যকে জিজ্ঞেস করল, ডিনারে সে কী খাবে? অর্ডার দিতে হবে তো। আধো ঘুমে আধো নেশায় অনর্ঘ্য তখন একটাই কথা ভেবে চলেছে। স্ত্রীর কথা তার কানেই ঢুকছে না। আবার জিজ্ঞেস করল দেবযানী। এবারের বলার ধরনটা আগের থেকে আরেকটু কঠিন, আরেকটু শীতল।

—আমি কিছু খাব না। তুমি যা হোক কিছু একটা অর্ডার দিয়ে দাও।

—মানে? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি তুমি এলে খাবার অর্ডার দেব। আর তুমি এখন বলছ কিছু খাব না। স্ত্রীর কথায় বিরত হল অনর্ঘ্য।

—তার মানেটা কী? এখনও তুমি কিছু খাওনি। আশ্চর্য!

—আশ্চর্যের কি অনর্ঘ্য? তুমি যা করছ সেটাই তো আশ্চর্য। সেই গেলে একবারও কি ভেবে দেখেছ আমার কথা। মোবাইলটাও তো বন্ধ।

অনর্ঘ্যর মনে পড়ল সত্যি তো তাই। তৃণার ঘরে ঢুকে কখন সে মোবাইল বন্ধ করে ফেলেছিল আর তো খোলা হয়নি। কোনও রকমে পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে সুইচ অন করল সে। মোবাইল অন করতেই একটা এস এম এস এল ওর মোবাইলে। হয়তো কিছুক্ষণ আগেই পাঠানো হয়েছিল ডেলিভার্ড হল এখন। তৃণার এস এম এস।

'এনজয় উইথ বউদি।'

অনর্ঘ্যর মনে হল ওকে ব্যঙ্গ করার জন্যই তৃণা পাঠিয়েছে। মেজাজটা আরও খিঁচড়ে গেল তার।

—সরি। মোবাইলটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—তুমি তো আজ খুব ড্রিঙ্ক করেছ দেখছি।

—হ্যাঁ, বিশ্বভারতীর পুরোনো বন্ধুরা এমন জোরজার করল।

—ওরা জোরজার করল বলে না হয় তুমি ড্রিঙ্ক করেছ। তা ওরা কি জোর করে তোমার মোবাইলটা হাত থেকে কেড়ে বন্ধও করে দিয়েছিল? যাতে তুমি তোমার বউয়ের সঙ্গে কথাও না বলতে পার! অনর্ঘ্য সারাটা সময় আমি এই ঘরে তোমার জন্য সেজে বসেছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি এলে একসঙ্গে বেরোব।

—তুমি তো একটু বেরিয়ে এলেই পারতে। তাছাড়া হোটেলের বাইরেটাও তো খুব সুন্দর। লনটা...

—থাক অনর্ঘ্য, থাক। আমি একা একা হোটেলটা ঘুরে দেখব বলে এত দূর আসিনি। কলকাতায় থাকলে তোমার

ক্লাস, ছাত্রছাত্রী, নোটস। আর বাইরে বন্ধুবান্ধব। তোমার জীবনে কি আমার কোনই দাম নেই? আমি এ সবে বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি অনর্ঘ্য...

দেবযানীর শেষের কথাগুলো বালিশে চাপা কান্নায় হারিয়ে গেল।

অনর্ঘ্যর দেবযানীর এই কথার কোনও উত্তর দেওয়ার নেই। সে শুধু নিজেকে বোঝাল, তাকে কেউ বোঝে না।

লিনা বেশ কিছুক্ষণ একাই ঘরের সামনের লাগোয়া বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। পুরোনো দিনের কত কথা ভিড় করে আসছে! ছোটবেলায় বসন্ত উৎসবের বেশ কিছুদিন আগেই সাজো সাজো রব পড়ে যেত। অনেকটা ঠিক 'পুজো আসছে' আমেজের মতো। হঠাৎ-ই এক আনন্দে বুকটা ভরে গেল তাঁর। সত্যি কত বছর বাদে আবার বসন্ত উৎসব দেখবেন তিনি। সেই কোন ছোটবেলায় বাবা বলতেন, ছোট ছোট ঘটনায় ছোট ছোট কারণে যে খুশি হতে পারে সে-ই সুখী হয়। জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে আজ লিনার সত্যিই মনে হয় জীবনটা শুধু কিছু মুহূর্তের। তা সুখ, দুঃখ সব ধরনের পুঁথির মালায় গাঁথা। মুখের পুঁতি যত সংখ্যায় বেশি হবে ততই মসৃণ জীবন। তবে সত্যি কি আর তাই হয়! সুখ-দুঃখ ঘুরেফিরে আসে। প্রাচীন বচন বড়ই কঠিন। ওটা তো ঋতসত্য। আজ অনেকদিন বাদে মনটা বড় হালকা লাগছে লিনার। এখন শান্তিনিকেতনে নিজের বলতে আর কেউ নেই। সেই সময়, সেই মানুষগুলো এখন শুধুই স্মৃতিতে। তবু লিনা বুক ভরে বসন্ত বাতাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে সব ভুলে যাচ্ছেন। মনে হচ্ছে সব আছে—পরিপূর্ণ। জীবনের চরম সত্যকে মেনেও কেউ যদি মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় তার থেকে ভালো কী আর হতে পারে?

এদিকে মোহনা আর সুস্মিতা জাঙ্ক জুয়েলারি কিনে সবে ঢুকল। বাংলোতে। সঙ্গে ছোট্ট সুস্নাতও ছিল। ফিরে মোহনা দেখল অরণি আর অগ্নি বাংলোর লনে বেতের চেয়ারে বসে গল্প করছে। ওদের দেখেই অগ্নি চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা সেই গিয়েছ তো গিয়েছই। ফেরার নাম নেই। আমরা এখনও চা না খেয়ে বসে আছি।'

অরণি অগ্নিকে বলল, 'আসলে মেয়েরা তো আবার মার্কেটিং বেরোলে ওদের মাথার ঠিক থাকে না।' মোহনাও হেসে উত্তর দিল, 'স্ত্রীদের দেখলেই মনে হয়, চা করতে বলি না? একটা দিন নিজেরাও তো চা করতে পারো।

অগ্নি বলল, 'চা তো রাঁধুনিই করে দিতে পারে। কিন্তু তোমাদের হাতের চা খাওয়ার জন্যই তো এই বসন্ত সন্ধ্যায় বসে আছি।'

সুস্মিতা বলল, 'আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে আসি।' বলে নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। অগ্নি চা খেতে চেয়েছে বলে কথা। মোহনা সোজা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। গিয়ে দেখল চিনি কম। রাঁধুনিকে বলল, 'যান, এক্ষুনি চিনি নিয়ে আসুন।' ঠিক সেই সময় জলের গ্লাস নেওয়ার অজুহাতে অগ্নি ঢুকল রান্নাঘরে। উদ্দেশ্য মোহনা।

মোহনাকে কতক্ষণ দেখেনি। ঠিক সেই সময় গোটা শান্তিনিকেতন জুড়ে হঠাৎ লোডশেডিং। অন্ধকারে প্রান্তিকের এক বাংলোর রান্নাঘরে 'চকাস' করে একটা শব্দ হল। যাকে এক কালজয়ী সাহিত্যিক বলেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট আর সুন্দর শব্দ। চুম্বনের শব্দ। বসন্তের হাওয়ায় সে শব্দ ভেসে গেল। যার জন্ম দুই নর-নারীর ওষ্ঠে।❖

(চলবে)

অলঙ্করণ : অঙ্কন বন্দ্যোপাধ্যায়

বারদি

বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকা থেকে ঘন্টাখানেক
সোনারগাঁ থেকে মিনিট পনেরো।

যে গ্রামগুলো দিয়ে এলাম
তার কোনও একটায়
আমার ঠাকুরদা টুলো পণ্ডিত ছিলেন
যে নদীটা টপকালাম
জল-শাসনের ফলে সে
মরোমরো
আমি বাঁচতে চাই
কিন্তু শরীর এক জায়গায় আর
আত্মা অন্যত্র থাকলে
এত ঝামেলা
মাইরি আগে বুঝিনি।
আমার সীমান্ত, আমার আইডেনটিটি, আমার কাঁটাতার
আমাদের সাতপুরুষে দখল হবার মতো
বড় বাস্তু ছিল না
কিন্তু দেশ ছিল।
তার নাম— 'মালবদিয়া মালখানগর'।
যেন লখনউ-এর নবাবের শতেক বাইজী
ঘুঙুরে আগুন তুলে নাচছে আর
আওয়াজ উঠছে —
'মাল অব দিয়া, মাল খা লে ...
অথচ বড়পিসি বলত, সাতটা গ্রাম খুঁজলে
একটা মাতাল মিলবে না—
মদ এমনই অচল ছিল পূর্ববঙ্গে।
আমার বিশ্বাস হয়নি।
কলকাতার ককটেল রাজারা
বেশিরভাগই রিফিউজি।
কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটল আমি
বলতে পারব না
কিন্তু ৯৬ সালের একটা রাত্রে
যখন বাবার বুকে ব্যথা শুরু হল
অনুভব করলাম, বিশ্বাস নেশার চাইতেও
মারাত্মক।

আমার বাবা বিশ্বাস করেছিল—
কেন্দ্রীয় কমিটিকে।
বিশ্বাস করেছিল, বাবার মামাবাড়ির গ্রাম বারদির
জ্যোতি বসু
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পতাকা তুলবেন লালকেল্লায়।
বিনিময়ে, উপহার পেয়েছিল হাট-অ্যাটাক।

পনেরো– ষোল বছর আগের সেই রাত
ফিরে আসছিল গাড়ির ঝাঁকুনিতে।
ট্রিগারে হাত পড়ে যাওয়ায় ছিটকে বেরোনো বুলেট
খেয়ালও করে না সামনে কেউ আছে কি নেই
ফুসফুস মন্থন করে উঠে আসা প্রার্থনা
পরোয়া করে না কোনও ভগবান
কান পেতে রয়েছেন কি না
কিন্তু সেই রাত
আমাকে সন্ধান দিয়েছিল এমন একজনের
যিনি ক্ষমতাশালী হোন বা না হোন
দরদী।

আজ বারদিতে তাঁর মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে
থমকে দাঁড়ালাম এক মুহূর্ত।

সেই রাতে বেঁচে গেলেও
বাবা অনেকদিন নেই
নেই খরা-বন্যা-রায়টে মরে যাওয়া আত্মীয়রা
জানি না আছে না মাটিতে মিশে গেছে
সেই মাটির ঘর
যার উঠোনে আমরা ঠুকুমার পোঁতা আমগাছটার
বয়স একশো ছাড়াল।

আমি অবধূতের চ্যালা নই যে
তন্ত্র- মন্ত্র দিয়ে জীবন যন্ত্রণা 'সলভ'
করার কথা লিখব
যতটা আস্তিক ততটাই সংশয়ী আমি
কিন্তু আজ ওই আগুনের মতো দুটো চোখ
আমার ভিতরের সব জ্বলা জুড়িয়ে দিল
আমি যে ওই চোখ দু'খানির দিকে
চোখ মেলে চাইতে পারলাম
সেই গর্বে আশার নিঃশ্বাস আতর হয়ে উঠল।
সৎসাহসের বিনিময়ে যারা পুরস্কার দেয়
জুতো পালিশ করিয়ে থাকতে দেয় জুতোর নীচে
তাদের সবাইকে একটা ফুৎকারে উড়িয়ে বললাম—
'জয় বাবা লোকনাথ'
আর একটা ম্যাজিক ঘটল সঙ্গে সঙ্গে।

চুন্নার ট্যাক্সি কিংবা ভাইয়াজির অ্যান্টিচেম্বারে
উদ্যত সব রেপিস্টের কপালে
মেয়েরা আঙুল দিয়ে লিখে দিল—
'জয় বাবা লোকনাথ'
সঙ্গে সঙ্গে স্থবির হয়ে গেল সমস্ত বিকৃত কাম
অনেক অনেক সিমেন্টের নীচে চলে সেল
হিংস্র সব লোহার রড...
জানি, স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে
কিন্তু পৃথিবীতে স্বপ্নেরও তো একটা ভূমিকা থাকবে
নইলে হিন্দু- মুসলমান- চাকমা- সাঁওতাল
সবাই কেন সোনার চেয়ে যত্নে রুমালে বাঁধছে
বারদির একখাবলা মাটি

হাইস্কুলে বাবার সহপাঠী আশরফ কাকু
আমার সঙ্গে এসেছিলেন।
ফেরার সময় বললেন, 'মনু আর একটা জায়গা
হইয়া যায়'।
না করতে পারলাম না।

ঘোর বর্ষার গ্রামে পাঁচ- সাত মিনিটের পথও অনেক।
ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে একসময় পৌঁছলাম
সেই দোতলায়
নিশিকান্ত বসু যেখানে সবাইকে বছরে একদিন
প্রসাদী পায়েস খাওয়াতেন বলে শোনা যায়।
ঘরে ঢুকতেই আশার কবজিতে পড়ল দু ফোঁটা জল।
আশার সত্যি মনে হল। ছাঁদ চুইয়ে পড়া বৃষ্টি নয়
জ্যোতিবাবু কাঁদছেন।

জীবনে পার্টি লাইন ভাঙতে না পারা উদ্বাস্তু জ্যোতিবাবু
মৃত্যুর পর পার্টিলাইন ভেঙে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের
অবর্ণনীয় কষ্টে কাঁদছেন।

আমি সেই জল ওই ঘরের দেওয়ালে ছুঁইয়ে
লিখলাম — 'জয় বাবা লোকনাথ'...

আমি কি ঐতিহাসিক ভুল করলাম?

অলঙ্করণ : দেবযানী

বিহুকথার সালতামামি

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

এপ্রিল মাস নাগাদ হয় 'বহাগ বিহু' বা 'রংগালি বিহু'। কাটি বিহু হয় অক্টোবরে। একে কাঙালি বিহুও বলা হয়, বলা হয় গরিব মানুষের উৎসব। আর মাঘবিহু হয় জানুয়ারি মাসে। বিহু হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের উর্বরতার প্রশ্নে সামিল।এই বিহু উৎসব আসামকে কেন্দ্র করে উত্তরপূর্ব ভারতে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় অঞ্চলের মানুষ যেমন এই উৎসবকে 'বইসাগু' বলে।

বিহু গান শুনেছি, নাচ দেখেছি, উৎসবেও অংশগ্রহণ করেছি। তবে সেবার যখন 'রংগালি বিহু' দেখতে গেছি, বা আরও পরিষ্কার করে বলতে একটা তথ্যচিত্র বানাতে গেছি তখন বিহুর এক বর্ণময় উৎস-সময়কে খানিকটা হলেও বুঝে ওঠার চেষ্টা করেছি। কেন না সব সময়েই মনে হয়েছে এই সমস্ত উৎসব, গান, বাজনা, নাচ আর মেলা বুঝতে বই হয়তো একটা ধারণা দেয়—সেটাও দরকার। কিন্তু আসল বিষয়টা ধরতে চাইলে এই সব মানুষের প্রাত্যহিকতার মধ্যে ঢুকতে হবে। অর্থাৎ সমস্ত উৎসবই ক্রমে গড়ে ওঠে, ঘন হয়ে আসে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি থাকে। এ ঘটনা যেমন একটা বা আর একটা পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি, ঠিক সেইভাবে, আজকে এই কর্পোরেট লাঞ্ছিত বিহুকেও অন্যভাবে

দেখার সুযোগ পেয়েছি।

আমি আমার ছোট একটা দল আর যন্ত্রপাতি নিয়ে উৎসবের দিন পাঁচেক আগেই হাজির হয়ে যাই অসমের শিবসাগর জেলার প্রত্যন্তে বানমুখ গ্রামে। যাতায়াত, হাটবাজার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রতিকূলতা থাকা সত্যেও এই মাঝারি চেহারার গ্রামটি যেন ক্যানভাসে আঁকা কোনও এক দড় চিত্রকরের ছবি। আমি ভাগ্যবান যে, বিহু সম্পর্কে বোঝাশোনার কাজটা সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলাম একজন প্রতিতযশা অহমিয়া লেখক পুষ্প গগৈ এবং তাঁর পরিবারের সান্নিধ্যে এসে। পুষ্পবাবু ওই গ্রামেরই হাইস্কুলের দীর্ঘদিনের অধ্যক্ষ ছিলেন। এতদঞ্চলে অসামান্য মান্যতা পান। বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। পেয়েছেন সমাদর। আর আমি পেলাম এমন এক শ্রীক্ষেত্র যা বিহু রঙে, ছন্দে, সুরে আর খাওয়ায় দাওয়ায় ভরপুর।

এখানে তথ্যের খাতিরে জানিয়ে রাখি তিন ধরনের বিহু উৎসব হয়। এপ্রিল মাস নাগাদ হয় 'বহাগ বিহু' বা 'রংগালি বিহু'। কাটি বিহু হয় অক্টোবরে। একে কাঙালি বিহুও বলা হয়, বলা হয় গরিব মানুষের উৎসব। আর মাঘবিহু হয় জানুয়ারি মাসে। বিহু হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের উর্বরতার প্রশ্নে সামিল। এই বিহু উৎসব আসামকে কেন্দ্র করে উত্তরপূর্ব ভারতে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কাছাড় অঞ্চলের মানুষ যেমন এই উৎসবকে 'বইসাগু' বলে। এরা মহাদেবের উপাসনা করে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। আদিরাও এই উৎসব উদযাপন করে ফাল্গুন মাসের প্রথম বুধবার। মিসিং আদিবাসী সম্প্রদায় বিহুকে বলে 'আলি আলি লিগাং'। নাগাদের মধ্যেও একটা বিশেষ সম্প্রদায় এই বিহু উৎসব পালন করে 'লাকু' নাম নিয়ে। কুকিরা বলে 'আরেম'। রাভারাও বিহু উৎসব করে 'বাইখ' নাম নিয়ে। তবে ঠাটেবাটে, আকারে-প্রকারে, ঘনঘটায় 'রংগালি' বা 'বহাগ বিহু' সবার ওপরে।

এ হল মেঠো উৎসব, যা মাটির সম্পদকে, দেহের উৎপন্নকে স্বাগত জানানোর উৎসব। অসমিয়া ভাষায় রং মানে হল আনন্দ। যে আনন্দের কোনও জাতপাত নেই সেই আনন্দঘন উৎসবই হল বিহু। বিহুর সঙ্গে যেহেতু ফসল উৎপন্নের অঙ্গাঙ্গিভাব তাই এর সঙ্গে জড়িত কৃষিকাজ, মাঠের কাজ, ফসল ফলানোর কাজ। আর হ্যাঁ শারীরবৃত্তীয় কাজ। যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে বিহু নাচের শরীরী ভঙ্গির ভাষাকে লক্ষ করেন তবে খেয়াল করবেন এ এক যৌনভঙ্গির দ্যোতক। মানে নতুন প্রজন্ম আগমনের ইচ্ছেছন্দ। অবিরাম এক পুঙ্খানুপুঙ্খ আবেগসাধিত ছন্দ যা দেহের ভাষাকে চিত্রিত করে যৌনতার রূপ-রাগে। আমরা যখন পৌঁছেছি তখন জোড় কদমে চলছে বিহু নাচের তালিম। বাড়িতে বাড়িতে, পাড়ায় পাড়ায়, মঞ্চে মঞ্চে নাচ হবে, গান হবে। এখন শুরু হয়েছে কর্পোরেট দৌরাত্ম্যে প্রতিযোগিতা। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার পুরস্কার আছে। এমনকী দামি বিদেশি গাড়ি পর্যন্ত পুরস্কারের জন্য মঞ্চের পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সে সব অবাঞ্ছিত প্রশ্নে যাচ্ছি না।

পুষ্পবাবুর বাড়িতেই আমরা থাকতে শুরু করি। উনি অত্যন্ত আধুনিক কিন্তু অহমিয়া সংস্কৃতির একজন গোঁড়া বাহক। ফলে

আমরা পেয়ে গেলাম মস্ত এক সুযোগ। আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে গেল গোয়াল পরিষ্কার করা। তার কারণ গরু বিহুতে একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যে কারণে প্রথম দিনের বিহুকে বলে 'গরুবিহু'। আগের দিন রাত থেকে চলতে থাকে খাওয়া দাওয়া। এও যেন আমাদের সেই পিঠেপুলির উৎসব। উৎসবের শুরুতেই মেয়েরা সেই আয়োজন সেরে ফেলে। এখানে উল্লেখ যোগ্য হল তিল পিঠা। চালের গুঁড়ো আর তিল দিয়ে তৈরি। ধোসার মতো মুড়িয়ে দেওয়া মচমচে—হালকা মিষ্টি আর খানিকটা নোনতা। প্রায় নেশার মতো একটার পর একটা খেয়ে নেওয়া যায়। দারুণ! ওই জন্য নেশা বললাম। এছাড়াও আছে খিলাপিঠা, নারকেল পিঠা, শুকনো পিঠা—সে সব হরেক-রকম পিঠা।

সকালবেলা শুরু হয় 'গরুবিহু'। তার আগে গরুকে স্নান করিয়ে তার শিং আর খুরে তেল মাখানো হয়। কপালে হলুদের ফোঁটা দেওয়া হয়। প্রায় সারা গায়েই হলুদ মাখানো হয়। ফুলের মালা দেওয়া গরুর গলায়। আর ব্যাটা গরু সঙ্গে সঙ্গে অতি তৎপরতায় সেই ফুল দড়িসহ চিবিয়ে খেয়ে নেয়। এখানে বলে রাখি, যে পিঠে তৈরি হয় তার প্রথমটি হল গরুর ভুজ্যি। এরপর গরুর পুরোনো দড়ি কেটে দিয়ে তাকে স্বাধীন

সাত-সাতটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে সাত রকমের শাক রান্না করে খাওয়া হয়—যাকে বলে 'সাতশাক'। এই দিন কাঁচা হলুদ আর সরষের তেল মেখে স্নান করার রেওয়াজ আছে।

করা হয়। আশপাশের নদী বা পুকুরে সেই গরু যথেচ্ছ দাপাদাপি করে। কচি ছেলে থেকে বয়স্করা পর্যন্ত এক ধরনের জলকেলি করে। সন্ধ্যায় যখন এই গুরুরা গোয়ালে ফেরে তখন আবার নতুন দড়ি পরানো হয়। বিশেষভাবে তৈরি পিঠে খাওয়ানো হয়। প্রদীপ জ্বালানো হয় গোয়ালঘরে। কামনা করা হয় যাতে রোগভোগ ভূতপ্রেত দূরে পালায়। বলতে ভুলে গেছিলাম, প্রথমদিন সকালবেলায় গাছ থেকে গাছে বাঁশের আঁকশিতে খাঁচা লাগিয়ে পিঁপড়ের ডিম পাড়া হয়। সে এক অসম্ভব উপাদেয় খাদ্য। দিনের বেলায় প্রথম পাতে সেই পিঁপড়ের ডিমভাজা পরিবেশন করা হয়। এ এক ডেলিশিয়াস পদ!

দ্বিতীয় দিন হয় 'মানুহবিহু'। এই দিনটায় বড়দের, আত্মীয়স্বজনদের সম্মান প্রদর্শন, শ্রদ্ধা জানাবার দিন। তারপরের দিন হল 'গোসাই বিহু'। অর্থাৎ কিনা কৃষ্ণের ভজনার দিন। এইভাবে সাত-সাতটি দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে সাত রকমের শাক রান্না করে খাওয়া হয়—যাকে বলে 'সাতশাক'। এই দিন কাঁচা হলুদ আর সরষের তেল মেখে স্নান করার রেওয়াজ আছে। বিহু যে আসলে খাওয়া-দাওয়া আর নাচ-গানের উৎসব, তা আগেই বলেছি। এ বাড়ি থেকে সে বাড়ি মানুষ যায় পিঠে আর মিষ্টি নিয়ে। বড়দের সম্মান জানাতে এক ধরনের গামছা দেওয়া হয়। অসমিয়াতে বলে গামোসা। এটাও আসামে ঐতিহ্যবাহী এক সংস্কৃতি। সাদা কাপড়ের ওপর লাল সুতো দিয়ে কাজ করা। এই গামোসা সারা বছরই অতিথি আপ্যায়ন করতে ব্যবহার করে আসামের মানুষ।

এবার আসি নাচ-গানে। এই সাত দিনের উৎসবে আসামের জাতীয় পোশাক পরে ছেলে-মেয়েরা নেচে-গেয়ে এক সাংগীতিক আবহ তৈরি করে। ঢোল-বাঁশি আর ফাটা বাঁশের ক্ল্যাপার দিয়ে মূলত প্রেমের গান হয়। এই গান আসলে ছিল শ্রুতির পরম্পরা। পরবর্তীকালে এই সব মুখে মুখে চলে আসা গান লেখা হয়। বিভিন্ন বয়সের মানুষ এই নাচে অংশগ্রহণ করে। তবে কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেই এর চল বেশি। বাড়ি বাড়ি যেমন এই নাচ-গান করে সাধারণ মানুষ। তেমনই তৈরি হয় মঞ্চ। যেখানে দলে দলে বাজনদাররা, গাইয়ে, নাচিয়েরা উপস্থিত হয়। আজকে অবশ্য সেই সব ঐতিহ্যপূর্ণ নাচ-গানে আধুনিকতার হাওয়া লেগেছে। এসেছে অতি-আধুনিক কিবোর্ড ও অন্য সব যন্ত্রপাতি। গানের সুরে সাগরপারের হিন্দি ছবির ছায়া পড়েছে।

বলা হয় অহম রাজা রুদ্রসিংহের সময় থেকে এই বিহুর প্রচলন। কালক্রমে এই বিহু হয়ে ওঠে সার্বজনীন উৎসব। বিহু সম্মেলন অর্থাৎ জাতীয় উৎসব শুরু উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল নাগাদ। সেই উৎসব, যা ছিল লোক সংস্কৃতি, তা ক্রমে হয়ে ওঠে জনতার সংস্কৃতি। ফলে এর যেমন নতুন বৈচিত্রপূর্ণ স্বভাব তৈরি হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যের, ধারাবাহিকতার খোলনলচেও পালটে যেতে থাকে। এই বিহু যেমন পালটে গেছে তেমনই আবার আম-জনতার সংস্কৃতি হয়ে উঠেছে। দেশ-দশ-কালের প্রেক্ষিতে এক নতুন থেকে নতুনতর সংস্কৃতির ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে উত্তরপূর্ব ভারতকে।

বিহুকথা আপাতত এইটুকুই থাক। ❖

ছবি: লেখক

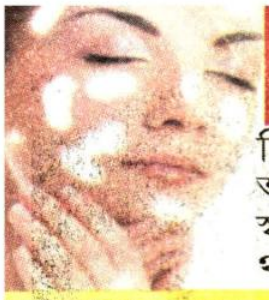

সাদা দাগ

এখন সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন

চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার সম্পূর্ণ গ্যারান্টি। আমাদের নতুন আবিষ্কৃত ওষুধ ব্যবহারের ৫-৬ ঘন্টার মধ্যে দাগের রঙ বদলে স্বাভাবিক চামড়ার রঙের সাথে মিশে যায় এবং চিরদিন তা বজায় থাকে। সম্পূর্ণ চিকিৎসার জন্য ফোন মারফৎ যোগাযোগ করুন।

যৌন সমস্যা

কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই আপনার লিঙ্গের দৈর্ঘ ৩-৪ ইঞ্চি বাড়িয়ে নিন। লিঙ্গকে স্থূল ও সোজা করে তুলুন এবং রতিক্রিয়া ২০-২৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী করুন। লিঙ্গ বর্দ্ধক বিনামূল্যে।

১০০% ভেষজ

আকর্ষণীয় স্তন

আমাদের শতকরা ১০০ভাগ গ্যারান্টিযুক্ত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াহীন ওষুধে আপনার স্তনকে সুন্দর, সঠিক আকৃতিবিশিষ্ট, আকর্ষণীয় এবং আঁটসাট করে তুলুন।

মেদবহুলতা

অতিরিক্ত ভুঁড়ি অবহেলা করবেন না। আপনার একগুঁয়ে মেদ তাড়িয়ে সঠিক দেহের আকার পেতে আমাদের চিকিৎসা গ্রহণ করুন।

স্মৃতিশক্তি

কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৩০ দিনের মধ্যে আপনার স্মৃতিশক্তিকে বাড়িয়ে তুলুন। বলিষ্ঠ স্মৃতিশক্তিই আপনার সাফল্যের সূচক।

উচ্চতা বৃদ্ধি

আমাদের শতকরা ১০০ভাগ ভেষজ চিকিৎসায় কোনরকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই ৬ সপ্তাহের মধ্যে উচ্চতা বাড়িয়ে তুলুন। এক্ষুনি ফোন করুন।

অর্শ

আমাদের চিকিৎসায় রক্তপাত বা ক্ষতযুক্ত অর্শ নির্মূল হয় রক্তপাত বন্ধ করে গুটিকে ভেতর থেকে শুকিয়ে পতন ঘটায়। এক্ষুনি ফোন করুন।

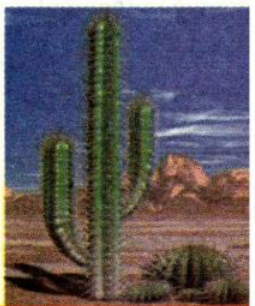

09661833217 / 09905429328 / 09525536846

ওষুধ কেনার আগে বিশ্বস্ততার প্রতীক বৈদ্য বিজয় কুমারের নাম দেখে নিন

আরব্য রজনী
চিত্রনাট্য: শিবপ্রসাদ সাহু
অঙ্কন: সুদীপ্ত কোলে ও সুমন সরকার
গন্ধটা ক্রমশ উগ্রতর হতে লাগল। মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরে উঠলো।
তারপর আর মনে নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম মনে নেই।
জ্ঞান ফিরতে উঠে দাঁড়ালাম
আ, আঃ! গন্ধটা বেশ হালকা হয়ে এসেছে। ঘরের ওপাশে আর একটা দরজা! দেখাই যাক—
আরে বাঃ, আর একটা ঘর! এ'তো প্রকাণ্ড বড়! ওখানে ওটা কী?
এ'তো একটা কালো ঘোড়া! বাঃ বেশ তাগড়াই! পিঠেই জিন সোনার তৈরি! নিপুণ স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম কারুকর্ম!!

লোভ সামলাতে না পেরে-পিঠে চড়ে বসলাম। ঘা কতক লাগাতেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠলো! সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া দু'পাশে দুটো ডানা মেলে ধরল।
হি-হি-হি
কী আশ্চর্য! ঘোড়াটার দু'খানা পেল্লাই পাখনা! এমনভাবে গোটানো ছিল যে, চোখেই পড়েনি এতক্ষণ!
আবার দু'ঘা দিতেই অদ্ভুত আওয়াজ তুলে সোঁ সোঁ করে আকাশের দিকে উঠতে লাগল।
ওঃ, কি দারুণ একখানা পক্ষীরাজ ঘোড়া! চলো, পক্ষীরাজ আরও উপরে। ঘর-বাড়ি মানুষজন সব পিপঁড়ের মতো মনে হতে লাগল।
হাঃ হাঃ, দেখো নীচের দিকে সব কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে।
আরিব্বাস! ওকী?

চলবে

সূক্ষ্ম শরীর স্থূল শরীর

হরিদাস পাল

যতই অপদার্থ বা অপগণ্ড হই না কেন, জীবনে প্রেমে পড়িনি তা তো নয়। পড়েছি, কিন্তু উঠতে পারিনি ভাই। কাউকে জাপটে ধরার সামর্থ্য আমার যৌবনে ছিল না। সাকুল্যে ওজন ছিল পনেরো কেজি আর উচ্চতা তিন ফুট দশ। গায়ের রং কেমন ছিল এ প্রশ্ন না তোলাই ভালো। কথায় বলে কয়লা শত ধৌতেন ময়লা না মোচন্তি। কোনও সুন্দরী দ্বাদশীর পেছনে হয়ত বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে যখন ক্লান্ত, তখন কাউকে কাউকে ডেসপারেটলি হয়তো ডেকে বলেছি, এই শুনছ, একটু দাঁড়াবে প্লিজ! একটা কথা ছিল। ফ্রক পড়া মেয়েরা হঠাৎ চমকে উঠত। পিছনে তাকাত। কেউ কেউ হয়তো এদিক ওদিক খোঁজার চেষ্টাও করত। কিন্তু দেখতে পেত না। মন্দ কপাল আমার ভাই, ঈশ্বর আমাকে যা যা দেবার তাই দিয়েছে, কিন্তু তা এতটাই অপ্রতুল যে কোনও কাজেই লাগল না। মাস্টারমশাইরাও ক্লাসে রোল কল করার সময় 'ইয়েস স্যার' শুনেও আশ্বস্ত হতেন না। কাছে গিয়ে হাত না টিপে দেখে নিত অমি সত্যিই এসেছি কি না।

সুবিধে যে একেবারে ছিল না তা তো নয়। মাস্টারমশাইরা চড় থাপ্পড় মারার রিস্ক নিত না। প্রথমত মার খাওয়ার জন্য যথেষ্ট শরীর আমাকে ঠাকুর দেননি, আর প্রায়ই আমাকে মারতে গিয়ে স্যারেরা মিস করে যেতেন। ফলত, চড় থাপ্পড়টা গিয়ে পড়ত পাশের ছেলেটার গালে! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে গেলে কেই বা বেশিদিন সহ্য করবে? অনেক ভাবনাচিন্তা করে শেষে হেডস্যারের বুদ্ধিতে আমাকে বসিয়ে রাখা হত মাস্টারমশাইদের টেবিলের এক কোণে। আমাদের পিটি টিচার জয়দেব স্যারের চেহারা ছিল পেল্লাই। তার ক্লাসে আমি প্রায়ই তার কোলে চড়ে ক্লাস করতাম।

মোটা হবার জ্বালাও কি কিছু কম! হাবুল ক্লাস সিক্সেই পঞ্চাশ কেজি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধিটা তো আমার মতো, ক্লাস সিক্সে তিনবার গাড্ডু মারার পর হাবুলকে আবার ক্লাস ওয়ানে নিয়ে যাওয়া হল।. কচি কাচাদের মাঝে ঘটোৎকচের মতো হাবুলকে বসে থাকতে দেখে চোখে জল আসত। আমার কিছু নেই, তাই বেঁচে বর্তে আছি। যার সব কিছুই বেশি বেশি এমনকী নির্বুদ্ধিটাও, তার কী কষ্ট বলুন তো! অনেকটা যেন 'নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথায় পেতে?'

এক বিপুলায়তন, মোটা শিরোমণি বিজনেস ম্যাগনেট তাঁর দুই সহকর্মীকে নিয়ে ডিনার খেতে গেছেন কোনও এক ফাইভ স্টারে। মেনু দেখে ম্যাগনেট মশাই অর্ডার দিলেন—ছ'প্লেট বিরিয়ানি। মটন চাপ পাঁচ প্লেট। তন্দুরি রুটি চব্বিশটা। চিকেন কারি আট প্লেট। অর্ডারের বহর দেখে আঁতকে উঠল সহকর্মীরা। সবিনয়ে জানাল, স্যার এত খাবার আমরা খেতে পারব না। স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, অর্ডারটা আমার জন্য। আপনারা কী খাবেন তা বেয়ারাকে বলে দিন।

ডায়েট নিয়ে মোটারা বড্ড উদাসীন। ঠিকই তো। এত বড় শরীরটা রাখতে খেতে হবে তো। যথেষ্ট ফুয়েল না দিলে গাড়ি তো অকেজো হয়ে পড়বে।

খাওয়া দাওয়া প্রসঙ্গে আরেকটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক বিরাট মোটা ডাক্তারের কাছে গেছে রোগা হবার পরামর্শ নিতে। ডাক্তার তো দেখেই চটে লাল, শরীরটা কী বানিয়েছেন! হাতিও লজ্জা পাবে। মোটা মিহি গলায় বলল, রোগা আমায় হতেই হবে। আপনি যা বলবেন তাই করব। ডাক্তারবাবু খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে। বলে প্রেসক্রিপশনে লিখতে শুরু করলেন, সকালে দু'টো বিস্কুট, এক কাপ চা। দুপুরে ভেজিটেবল স্যুপ আর দু'পিস পাঁউরুটি।

বিকেলে শুকনো মুড়ি এক মুঠো। রাতে হাতে সেঁকা দু'টো রুটি আর দু'হাতা ডাল। পেশেন্ট প্রেশক্রিপশন পেয়ে তো খুব খুশি। ভিজিট মিটিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে কী মনে করে বলল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এগুলো কি খাবার আগে খাব, না পরে?

আমার মতো প্যাটকাদের নিয়ে গল্পগাছা খুব একটা নেই। থাকবেই বা কেন? অশরীরীদের নিয়ে গা ছমছমে আষাঢ়ে গল্পের শেষ নেই। কিন্তু যাদের 'শরীর আছে অথচ নেই' তাদের নিয়ে খুব একটা গপ্পোগাছা বাংলা সাহিত্যে নেই। আচ্ছা সত্যি কি আপনি অশরীরী দেখেননি? নাম শুনেছেন, দেখেননি। আচ্ছা আপনি কখনও মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের কোনও ক্যাডার দেখেছেন? ঢপ মারবেন না। আপনি যে দেখেননি তা আমি নিশ্চিত। সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনও একক মিছিল দেখেছেন? দেখেননি। এমনকী আর এস পি বা সিপিআই? একদা হয়তো ছিল। এখন আর নেই। থাকলেও সূক্ষ্ম দেহে।

এরকম সূক্ষ্ম দেহের লম্বা লিস্টি আমি দিতে পারি যারা আমার মতোই প্রকৃত অশরীরী। ❖

অলঙ্করণ : সুদীপ্ত মণ্ডল

Lose Control in Port Blair!

Facilities in the Resort

- Duplex Accommodation
- Pent House Accommodation
- 24-hour Room Service
- Local Sightseeing
- Island Tours
- Conference Room
- Banquet Hall
- Gymnasium
- Swimming Pool
- Health Club
- Spa

Delicious delicacies make it a gourmet's paradise.

When it comes to choosing from a wide array of delicacies, you're the connoisseur. Since there's no retreat without good food, your search continues. And we inspire you, so much so, that you can't resist. Yes, we're talking about Rose Valley Resort, Port Blair, the ultimate place for an exotic stay with fabulous dining facilities. Once you get in, you've to tighten up to lose control over your emotions.

Rose Valley
Hotels & Resorts

www.rosevalleyresorts.com
For booking, contact: 98316 99888 / 90070 22890 / 91633 99988

ক্যান্সার
মানেই মৃত্যু নয়

প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ভালো থাকুন ক্যান্সারেও

বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে নিরন্তর গবেষণা ও অনলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার ক্যান্সারের চিকিৎসায় এমন এক বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছে যা একই সাথে নিরাপদ, সাশ্রয়কর এবং যন্ত্রণাহীন। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক মতে মানবীয় ভোজ্য পদার্থ থেকে সংগৃহীত পোষক শক্তির এই চিকিৎসা, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে রাখে মানুষকেই। একেবারে শুরুর দিন থেকেই সংস্থার অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্য, ডায়াটেশিয়ান এবং অঙ্কোলজিস্টরা সর্বদাই মানুষের পাশে থেকে, তাঁদের এই মারণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেন।

"ভাবতেই পারিনি ক্যান্সারের চিকিৎসা এত সহজ এবং নিরাপদ হতে পারে"

কমলকলি মুখার্জী
শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ
ক্যান্সারের ধরন - **স্টমাক ক্যান্সার**
চিকিৎসাকাল - **১৯৯৮-২০০২**

অনেকদিন ধরেই অসহ্য পেটের ব্যথায় ভুগছিলাম এবং তা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। স্থানীয় চিকিৎসাতে কোনও সুরাহা না মেলায় বড় ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। প্রথমে শিলিগুড়ি এবং পরে কলকাতায় সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানতে পারি আমার পাকস্থলির ৭৫ শতাংশই ক্যান্সারে আক্রান্ত, এমনকি বাদ যায়নি অগ্নাশয়ও। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে অপারেশনের উদ্যোগ নেন। তাতে সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। জানা যায় পচনের কারণে অপারেশনের জায়গায় কিছুতেই সেলাই করা সম্ভব হচ্ছে না। অসহায় ডাক্তারেরা জানিয়ে দেন, 'আর কিছুই করার নেই'। তখন শুধুই মৃত্যুর অপেক্ষা।

দিশেহারা আমার স্বামী তখন হঠাৎ করেই এক বন্ধু মারফত ডি. এস. রিসার্চ সেন্টারের সম্বন্ধে জানতে পারেন। প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি যে ক্যান্সারের চিকিৎসা এত সহজ, নিরাপদ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন হতে পারে। এরপর সবটাই ইতিহাস। ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার থেকে মাত্র ১৫ দিনের চিকিৎসা নিয়ে আমার শারীরিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে থাকি।

এখন আমি সময় কাটাই আর্ত মানুষের সেবায়। বলতে দ্বিধা নেই, খুবই আনন্দ পাই যখন কোনও ক্যান্সার রোগী আমাকে দেখে নতুন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা পায়। ধন্যবাদ ডি. এস. রিসার্চ সেন্টার আমাকে আমার স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।

D.S. Research Centre
LET US SAVE OUR WORLD FROM CANCER
An "ISO 9001:2008" Organisation

P - 26, C.I.T. Road, Scheme - VI M, Opp. Kankurgachi Pantaloons, Kolkata - 700 054
Ph: + 91 33 40164141
E-mail: dsrckolkata@gmail.com, Website: www.dsresearchcentre.com

Our Clinics: Bengaluru | Guwahati | Kolkata | Mumbai | Silchar | Varanasi

Find us on: | | LinkedIn | YouTube